মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২১ ঈসায়ী
সফর-রবি: আউ:-১৪৪৩ হিজরী
আশ্বিন-কার্তিক-১৪২৮

মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ জামে মসজিদ, পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব	৪র্থ বর্ষ	৭ম সংখ্যা
অক্টোবর		২০২১ ঈসায়ী
সফর-রবিঃ আউঃ		১৪৪৩ হিজরী
আশ্বিন-কার্তিক		১৪২৮ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর বিন আবদুল জব্বার

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ ইবরাহীম আবদুল হালীম মাদানী
শাইখ আবদুন নুর বিন আবু সাঈদ মাদানী
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪ মোবাইল: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

সম্পাদক	: ০১৭১৬১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক	: ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
সার্কুলেশন বিভাগ	: ০১৭৮৮-৪০২৯৮৮
	০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল

tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٥٠٦٠٥٤٠
المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس التحرير : العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، المشرف العام للمجلة (مؤقتا) : السيد محمد روح الأمين، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياشي ، مساعد التحرير : الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

- দারসুল কুরআন (দু'আ-নিয়মাবলী ও সঠিক সময়).....০৩
  শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
- দারসুল হাদীস (মুসলিমদের ঈদ).....০৬
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
- সম্পাদকীয় (নতুন প্রজন্মের চোখে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আগামী দিন).....০৯

প্রবন্ধ :

- সূরা আল-ফাতিহা: তাফসীর ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসাআলা ১১
  অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
- আল-কুরআন গবেষকের গুণাবলী.....১৬
  প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
- ঈদে মিলাদুন্নাবীর বাস্তবতা ও কুরআন-সুন্নাহ'র ফায়সালা.....২০
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ.....২৫
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
- বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ..... ২৮
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক
- কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পুনর্গঠনে প্রফেসর এ. এইচ, এম শামসুর রহমান স্যার (রহি:)-এর অবদান ভোলার নয় ৩২
  মো: আবুল খায়ের

শুব্বান পাতা

- অনুকরণীয় আদর্শ; মানুষ মুহাম্মদ (ﷺ) ৩৫
  মো: আবদুল হাই
- রবিউল আওয়াল মাস; জানা-অজানা তথ্য.....৩৮
  আল-আমিন বিন আকমাল
- এক গৌরবময় অতীত থেকে বেদনাদায়ক বর্তমান; নেপথ্যে কারণ ৪০
  সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
- কবিতার সমাহার.....৪৪
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৫

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

দু'আ-নিয়মাবলী ও সঠিক সময়

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী*

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ : আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে- তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।[১]

অবতরণের প্রেক্ষাপট : আবূ মুসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা কোন এক যুদ্ধে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেক উঁচু স্থানে ওঠার সময় এবং উপত্যকায় অবতরণের সময় উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে যাচ্ছিলাম। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকটে এসে বললেন: হে মানবমণ্ডলী! নিজের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা কোন কম শ্রবণকারী ও দূরে অবস্থানকারীকে আহ্বান করছ না, যাঁকে তোমরা আহ্বান করছ তিনি তোমাদের স্কন্ধ অপেক্ষাও নিকটে রয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমিও তদ্রুপ, যখন সে আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই।[৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : দু'আ হলো ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ইবাদত বা ইবাদতের মূল। অথবা দু'আই হলো ইবাদত। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ- অর্থাৎ দু'আই হলো ইবাদত[৪] এবং একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার রবের নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম বা ব্যবস্থা হলো দু'আ। কেননা দু'আর মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি বারী তা'আলার বড়ত্ব, শক্তি, ক্ষমতা এবং তার অমুখাপেক্ষিতার স্বীকৃতি প্রদান করে, সঙ্গে নিজের অক্ষমতা, অপারগতা এবং দুর্বলতার কথাও তুলে ধরে। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।[৫] পাশাপাশি তিনি দু'আ কবুল করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ-আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। এ মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ .

আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।[৬]

দু'আর ব্যাপারে সকল মানুষকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে :

(১) মুশরিক-যারা গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে, যদিও তারা সময় বিশেষে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আন্তরিকভাবেও দু'আ করে, তথাপি তারা উপকৃত হয় না। কারণ তাদের ওপর থেকে আরোপিত সমস্যা উঠে গেলে তারা দু'আ করা ছেড়ে দেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

অর্থ, তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৬

[২] আহমাদ-৪/৪০২

[৩] আহমাদ-৩/২১০

[৪] আবূ দাউদ হা: ১৪৭৯, তিরমিযী হা: ২৯৬৯

[৫] সূরা গাফির আয়াত: ৬০

[৬] তিরমিযী হা: ৩৩৭০

তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।[৭] এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

যে ব্যক্তি চায় বিপদাপদে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করুন সে যেন তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দু'আ করে।[৮]

(২) এমন সম্প্রদায়-যাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্য দান করেছেন, কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো করেই না বরং নাফরমানী ও অহঙ্কার করে থাকে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

নিশ্চয় যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৯]

(৩) মুমিন বান্দাগণ- যারা তাদের রবের ক্ষমতা ও মর্যাদার মূল্যায়ন করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এবং পরিত্রাণ মিলবে না আল্লাহর দয়া ছাড়া, এসব মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

তারা সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করত এবং আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী ।[১০]

দু'আর ব্যাপারে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক :

১. ইখলাস অর্থাৎ দু'আ কেবল আল্লাহর নিকটেই করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে।[১১] আর যেহেতু দু'আই হলো ইবাদত, কাজেই দু'আ করতে হবে অবশ্যই ইখলাসের সঙ্গে। এ ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾

আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।[১২]

২. দু'আ কবুলের ব্যাপারে কেউ তাড়াহুড়া করবে না। এ মর্মে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করতে যেয়ে বলে, দু'আ করেছি কিন্তু কবুল করা হয়নি।[১৩]

৩. পাপ কাজ করার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কেউ দু'আ করবে না।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: «قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ»

---

[৭] *সূরা আনকাবুত আয়াত: ৬৫*
[৮] *তিরমিযী হা: ৩৩৮২*
[৯] *সূরা গাফির আয়াত: ৬০*
[১০] *সূরা আম্বিয়া আয়াত: ৯০*
[১১] *সূরা বাইয়্যিনাহ আয়াত: ৫*
[১২] *সূরা জিন আয়াত: ১৮*
[১৩] *সহীহ বুখারী হা: ৬৩৪০*

আল্লাহ তা'আলা দু'আকারীর প্রার্থনা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন যতক্ষণ তার দু'আয় পাপজনিত কোন কথা মিশ্রিত না থাকে অথবা নাড়ির (রক্তের) সম্পর্ক ছিন্ন না করে অথবা দু'আর ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাড়াহুড়া করা কী? তিনি বললেন: ঐ ব্যক্তি বলে, আমি দু'আ করতেই রয়েছি, অথচ দু'আ কবুল হওয়ার কোন সুফল পাচ্ছি না; এভাবে সে দু'আ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আস্তে আস্তে দু'আ পরিত্যাগ করে।[১৪]

৪. আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হয়ে, একাগ্রতা ও বিনম্রভাবে এবং কবুলের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা রেখে দু'আ করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন:

ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে কবুলের ব্যাপারে আস্থাবান হয়ে, আর জেনে রাখবে যে, আল্লাহ গাফেল ও উদাসীন ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন না।[১৫]

৫. পাপের কাজ থেকে বিরত হয়ে আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। [১৬]

৬. হারাম উপার্জন দ্বারা ক্রয় করা খাদ্য-পানীয়, লেবাস-পোষাক বর্জন করে দু'আ করা।

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "

হে লোকসকল! আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন; যে আদেশ রাসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।''[১৭]

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।'[১৮]

অতঃপর রাসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলায় ধূসরিত, এলোমেলো বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দু'আ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে?

দু'আ করতে হবে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অবলম্বনে :

১. আল্লাহর তা'আলার প্রশংসা এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালামের মাধ্যমে দু'আ আরম্ভ করা।

২. দু'আর সময় দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া-এমনটা বলবে না যে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর।

৩. পবিত্র অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করবে।

৪. দু'আর সময় নিজের কৃত পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করতঃ আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহের বিষয়টি স্বীকার করে দু'আ করবে। *(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

[১৪] *সহীহ মুসলিম হা: ২৭৩৫*
[১৫] *তিরমিযী হা: ৩৪৭৯*
[১৬] *সূরা রা'দ আয়াত: ১১*
[১৭] *সূরা মুমিনুন আয়াত: ৫১*
[১৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৭২*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

মুসলিমদের ঈদ

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা *

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ মাদীনাতে এসে দেখতে পেলেন, মাদীনাবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট দু'টি দিন রয়েছে, যে দিবসে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ করে থাকে। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিন কিসের? তারা বললো: আমরা জাহিলী যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। রাসূল ﷺ বললেন: মহান আল্লাহ তোমাদের এ দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।[১৯]

রাবী পরিচিতি: আনাস ইবনু মালিক ইবনু নাযার ইবনু যামযাম ইবনু যায়দ ইবনু খুরাম ইবনু জুনদাত ইবনু আমির ইবনু গান্‌ম ইবনু আদী ইবনু নাজ্জার আনসারী। উপনাম আবূ হামযাহ প্রসিদ্ধ সাহাবী রাসূল ﷺ-এর খাদেম। পরবর্তীতে তিনি বাসরাতে বসবাস করেন।

তাঁর মায়ের নাম উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান ইবনু খালিদ ইবনু যায়দ ইবনু হারাম। ইমাম যুহরী আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নাবী ﷺ যখন মাদীনাতে আগমন করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। আর তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন আমার বয়স ছিলো বিশ বছর।[২০]

আনাস ﵁ থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমাকে নিয়ে আমার মা উম্মু সুলাইম রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন আমি শিশু। অতঃপর আমার মা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ উনাইম (ছোট শিশু) তার জন্য আপনি দুআ করুন। তখন নাবী ﷺ বললেন: হে আল্লাহ তার মাল ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আনাস ﵁ বলেন: আমি দুটি অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তান পেয়েছি। আর তৃতীয় টি অর্থাৎ জান্নাত পাওয়ার আশায় আছি।[২১]

তিনি নিজে নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অনেক সাহাবী সূত্রে নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যে সমস্ত সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো:

উবাই ইবনু কাব, উসাইদ ইবনু হুযাইর, সাবেত ইবনু কাইম, জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ, যাইদ ইবনু সাবেত, আবূ তালহা ﵁ প্রমুখ।

তাঁর কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন : আবান ইবনু সালেহ, আবান ইবনু আবী আইয়্যাশ, ইবরাহীম ইবনু মায়সারাহ, আঝহার ইবনু রাশেদ, ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী তালহা, আসয়াদ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ, ইসমাঈল ইবনু আব্দুর রহমান প্রমুখ গণ।

আনাস ইবনু মালিক ﵁-এর মৃত্যু সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে তিনি ৯৩ হিজরীতে ১০৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা: **قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ** রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাতে আগমন করলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মাদীনাতে আগমন করলেন। **وَلَهُمْ يَوْمَانِ** তাদের দু'টি দিন ছিল। অর্থাৎ মাদীনাবাসীর দু'টি বিশেষ দিন ছিল। ঐ দুটি দিবসের নাম ছিল **يوم النيروز** ও **يوم المهرجان** । কামূস গ্রন্থকার বলেন: **النيروز** শব্দটি উর্দু **نوروز** নাওরোজ শব্দের আরবী রূপ যাকে বাংলায় নববর্ষ বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সৌর বৎসরের প্রথম দিন। **مهرجان** বৎসরের

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৯] আবূ দাউদ হা: ১১৩৪

[২০] সহীহ মুসলিম হা: ২০২৯

[২১] আদাবুল মুফরাদ হা: ৬৫৩

ঐদিনকে বলা হয় যেদিনটির দিবা ও রাত্রি সমান অনুরূপভাবে দিনটির আবহাওয়ার তাপমাত্রা ও শীতলতাও সমান সমান। যার ফলে পূর্বকালের জ্ঞানীগণ ঐদিন দু'টিকে তাদের জন্য ঈদের তথা খুশীর দিন ধার্য্য করেছিলেন। তাদের যামানায় তাদের অনুসরণে ঐদিন দু'টিকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতো। পরবর্তীতে নাবীগণ ঐ নির্ধারিত দিনের ঈদ আনন্দকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। **فِي الْجَاهِلِيَّةِ** জাহিলী যুগে, অর্থাৎ ইসলামী যুগের আগমনের পূর্বে।

أبدلكم بهما خيرا منهما ঐ দু'টি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন। অর্থাৎ যা ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর। পরিবর্তিত দিন দু'টিকে উত্তম এ জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের ঐ দিন দু'টিতে ইহকালীন ও পরকালীন কোন কল্যাণ ছিল না বরং তাতে তো তারা অনর্থক আনন্দফূর্তি করতো। ঐ দু'দিনের পরিবর্তে আল্লাহ এমন দু'টি দিন দিয়েছেন যাতে তারা আল্লাহর ইবাদতে মত্ত থাকবে। আর প্রকৃত আনন্দ তো ইবাদতের মধ্যে নিহিত। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾

বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের আনন্দিত থাকা উচিৎ।[২২]

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য অনুগ্রহ ও দয়া করে কুরআন নাযিল করে তাদের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। আর এ কল্যাণে ধন্য হয়ে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ। আর এ আনন্দিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তার শুকরিয়া আদায় করা। মুযহির বলেন: অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, **النيروز** তথা নববর্ষ ও মিহরাজান দিবস পালন করা বা এ ছাড়া কাফিরদের কোন ঈদের দিনে মুসলিমদের আনন্দ উৎসব পালন করা নিষিদ্ধ।

আবূ হাফস আল-কাবীর আল-হানাফী বলেন: নববর্ষের দিনে কেউ যদি ঐ দিনের সম্মানার্থে একটি ডিম ক্রয় করে তা কোন অমুসলিমকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে তাহলে সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। কাজী আবুল মাহাসিন আল হাসান বিন মানসূর বলেন: যে ব্যক্তি নববর্ষের দিন এমন কিছু ক্রয় করলো যা বৎসরের অন্য সময়ে ক্রয় করে না অথবা এ দিনে কাউকে কোন উপঢৌকন দান করলো যেমনটি অমুসলিমগণ এ দিনের সম্মানার্থে করে থাকে তাহলে সে কুফরী করলো। [২৩]

"**يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ**" : কুরবানীর ঈদের দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন। কুরবানীর ঈদের দিনকে আগে উল্লেখ করার কারণ হলো এটি হচ্ছে বড় ঈদ। তাই হাদীসে ঈদুল আযহাকে ঈদুল ফিতরের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তীবা (রাহি) বলেন: নববর্ষে খেলাধুলা করা এবং আনন্দ-উৎসব করা নিষিদ্ধ।[২৪]

হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুসলিমদের ঈদের দিন দু'টি।

১. ঈদুল আযহা ২. ঈদুল ফিতর। এ ছাড়া জুমুআর দিনকেও ঈদের দিন বলা হয়, যেমনটি হাদীসে এসেছে।

«إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»

নিশ্চয় এ দিনকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য।[২৫] মুসলিমদের জন্য উল্লেখিত তিন দিন ব্যতীত অন্য কোন ঈদ নেই।

অনেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিনকে ঈদে মীলাদুন্নাবী হিসেবে পালন করে থাকে। কিন্তু এ দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করার ইসলামী শারীয়াতে কোন ভিত্তি নেই। নাবী ﷺ নিজে এ দিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করেননি এবং তার পরবর্তীতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কিংবা তাবে-তাবেয়ীনও কখনো এ দিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করেননি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

[২২] *সূরা ইউনুস আয়াত: ৫৮*

[২৩] *আওনুল মা'বূদ অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা*

[২৪] *আওনুল মা'বূদ*

[২৫] *ইবনু মাজাহ হা: ১০৯৮ হাসান*

যদি নাবী ﷺ-এর জন্মদিনকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করার মধ্যে কল্যাণ থাকতো তাহলে অবশ্যই তিনি তাঁর উম্মাতকে তা অবহিত করতেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদা তা পালন করতেন এবং অন্যান্য সাহাবাগণও তা পালন করতেন এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। কিন্তু কেউই তা করেননি। এ থেকে নিশ্চিতভাবেই জানা যায় তা সুস্পষ্ট বিদ'আত, যা পরিত্যাজ্য। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

যে ব্যক্তি আমাদের বিধানে (ইসলামে) নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[২৬] তিনি আরো বলেছেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যা সম্পর্কে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[২৭]

শুধুমাত্র নাবী ﷺ-এর জন্মদিন নয় বরং যে কারো জন্মদিন, মৃত্যু দিবস, বিবাহবার্ষিকী- এ ধরনের কোন দিবস পালন করা, যদিও তা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় না, তথাপি তা পরিত্যাজ্য। কারণ এগুলোর উৎস হল পাশ্চাত্যের বা বিজাতীয়দের অনুসরণ। আর রাসূল ﷺ বলেছেন: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[২৮] তিনি আরো বলেছেন: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ যিনি যাকে ভালোবাসেন তার হাশর তার সাথেই হবে।[২৯]

কারো অনুসরণ-অনুকরণ তার বা তাদের কৃষ্টি কালচারকে ভালোবাসার কারণেই হয়ে থাকে। অতএব, ইসলামী কৃষ্টি-কালচার বাদ দিয়ে অমুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার পালন করে আধুনিক মুসলিম সাজার কোন সুযোগ নেই। বরং তা জাহান্নামের পথকেই প্রশস্ত করে। রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয় বরং তার অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

হে নাবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতি দয়ালু।[৩০]

নাবী ﷺ আরো বলেছেন:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ.

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো।[৩১]

কুরআনুল কারীম ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের রাস্তা একমাত্র রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ পরিত্যাগ করে বিদ'আতে হাসানার নামে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত পরিত্যাগ করে বিদ'আতের প্রচলন ঘটিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসলিমদের জন্য ঈদের দিন তিনটি। (১) ঈদুল আযহার দিন (২) ঈদুল ফিতরের দিন (৩) জুমু'আর দিন।

২. অমুসলিমদের অনুসরণে কোন উৎসব পালন বৈধ নয় যেমন জন্মদিন, মৃত্যু দিবস, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি।

৩. নাবী ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. যে ব্যক্তি যে কালচারের অনুগামী তাকে তাদের সাথেই হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। ❑❑

[২৬] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮*
[২৭] *সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮*
[২৮] *আবূ দাউদ হা: ৪০৩১*
[২৯] *সহীহ বুখারী হা: ৬১৬৯*
[৩০] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৩১*
[৩১] *সহীহ বুখারী হা: ২৯৫৭*

সম্পাদকীয়

নতুন প্রজন্মের চোখে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আগামী দিন

الافتتاحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ইনশা আল্লাহ, এ অক্টোবর মাসেই বর্ধিত কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। নতুন প্রজন্মের নবীনদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা এবারের কমিটির মাধ্যমে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখছে, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-কে নিয়ে। সবাই জানেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস একটি অরাজনৈতিক দাওয়াতী সংগঠন। মূল কাজ হচ্ছে মানুষকে ইসলামের পথে, কুরআন সুন্নাহর দাওয়াত দেয়া। বাস্তবে মদীনার ইসলাম বাংলাদেশে চর্চার অভাবে মনগড়া সুবিধাবাদী বিদ'আত ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন করেছে এ জনপদকে। যে কারণে প্রকৃত তাওহীদের দৃঢ়তা, সুন্নাহর অনুশীলন অর্জিত হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের এ সময়ে দেশেদের মুসলিমদের মাযারে-কবরে অশিক্ষিত ভণ্ডমূর্খদের পিছনে ছুটতে দেখা যায়। এখনো তাবীজ-কবজ, সূতা-মাদুলী দ্বারা রোগ-ব্যধি নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। অজ্ঞতার কারণে মানুষ পীরের দরবারের খাবারকে তাবারুক মনে করে, কবর মাযার ধোয়া-মুছা ময়লা পানিকে মহৌষধ মনে করে মুখে-শরীরে মাখে। মাযারের শৌলমাছ, কচ্ছপ, কাছিমের নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণে সন্তান কামনা করে। এসবের মূল কারণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এ অভাব অনুভব করেই আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দাওয়াতী কাজের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন জমঈয়তে আহলে হাদীস। পাশাপাশি কুরআন সুন্নাহর সঠিক ইলম অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বহুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের সেরা শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চতর জ্ঞানগবেষণার ও কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে অভিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার তৈরির লক্ষ্যে সাভারের সন্নিকটে, বর্তমান আশুলিয়া থানার বাইপাইলে একটি ইসলামী বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয় করেন। সেখানে একটি উচ্চতর মাদরাসার পরিকল্পনাও করা হয়। আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারীর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। লালমাটিয়ার অফিসে দিনরাত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অভিজ্ঞ কয়েকজনকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, সিলেবাস, একাডেমিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, অধিত বিষয়সমূহ, শিক্ষক কর্মচারীর আবাসন, ছাত্রাবাস, ডরমেটরী তথা সার্বিক বিষয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরিতে নির্ঘুম সময় পার করেন। অবসর জীবনের বিশ্রামকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে এ শিক্ষাবিদ জ্ঞানপিপাসু সাধক, শেষ জীবনের সাধনারূপে নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে। কিন্তু শুরু হওয়া কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় তাঁকে তাঁর মালিক দিয়ে দিলেন স্থায়ী বিশ্রাম। চলে গেলেন, মাস্টার প্ল্যানের কাগজ, যাবতীয় নথিপত্র টেবিলের উপর রেখে, সবাইকে অশ্রুবন্যায় ভাসিয়ে যাত্রী হলেন অন্তীম পথে, জান্নাতের রাহে। এরপর জমঈয়তের হাল ধরলেন প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম স্যার। এগিয়ে নিলেন আরো কিছুদূর এর কার্যক্রম। এরপর ড. ইলিয়াস আলী স্যার এটিকে বাস্তবের পর্যায়ে নিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠিত হল বাইপাইলে অত্যাধুনিক দৃষ্টিনন্দন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। অধ্যাপক মোবারক আলী স্যারের সময় এটি সরকারের নিকট থেকে একাডেমিক অনুমোদনের যাবতীয় শর্ত পূরণ করে কাগজ-পত্রও প্রস্তুত করা হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ! প্রফেসর ড. আব্দুল বারীর স্বপ্ন আজ বাস্তবে দৃশ্যমান। এগিয়ে নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রাকে। জমঈয়ত নবীনদের চোখ দিয়ে দেখে সহস্র শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত বাইপাইলের সবুজ ক্যাম্পাস। লাখ লাখ জমঈয়ত কর্মীরা হবেন আনন্দে অভিভূত। যত দ্রুত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা যাবে, তত স্বল্প সময়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অগ্রযাত্রা আরো অনেকগুণ বেগবান হবে। দেশব্যাপী জমঈয়তের ওপর মানুষের আস্থা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে

হাদীস-এর সাবেক নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যত জমঈয়তের কথা ভেবে এর আয়ের উৎস হিসেবে ক্রয় করে রেখে গেছেন মহামূল্যবান সম্পদ। বাইপাইলে রয়েছে ৪৮ বিঘা জমি, যাত্রাবাড়ীতে ২৮ কাঠা ও ঢাকার প্রাণকেন্দ্র নবাবপুরে রয়েছে ১০ কাঠা জমি। নবাবপুরের জমি ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। যার মূল্য কোটি কোটি টাকা। এ মহামূল্যবান জমিতে ১৬ তলা জমঈয়ত টাওয়ার নির্মাণের রয়েছে পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। এতেও আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই। একটি মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাই মেগা পরিকল্পনা। নবাবপুরের ক্ষেত্রেও তাই। এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন। কমিটি এই টাওয়ার নির্মাণের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের জন্য কনসাল্টিং ফার্মের সাথে চুক্তি, রাজউকের অনুমোদন, সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি, ডিজাইন ড্রয়িং ও তা পাশ করানো। কার্যাদেশ প্রদানসহ যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে টাওয়ারের কাজ শুরু করা। এছাড়াও জমঈয়তকে গতিশীল করার জন্য আরো যেসব বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে নবীনরা তা হলো: কেন্দ্রীয় দফতরকে মাল্টিপারপাস কাজের জন্য এর পরিধি সম্প্রসারণ করা। জমঈয়তের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মাদরাসাগুলোকে জামিআতে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) উন্নীত করে মদীনার আদলে ৪ বছর মেয়াদী বি.এ (অনার্স) কোর্স, মাস্টার্স কোর্স চালু করা। আহলে হাদীস প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্সকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী (রহমাহুল্লাহি)-এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। বাইপাইলে দেশের সর্ববৃহৎ আহলে হাদীস জামে মসজিদ নির্মাণ করা ও বাইপাইল মডেল মাদরাসাকে ডিগ্রী (কুল্লিয়া) পর্যায়ে উন্নীত করা। সেখানে একটি ভোকেশনাল কোর্স সম্পন্ন কারিগরি কলেজ স্থাপন করা। প্রত্যেক জেলায় একটি করে কুল্লিয়া মাদরাসা স্থাপন ও কমপক্ষে একটি উচ্চতর মহিলা মাদরাসা স্থাপন করা। জেলায় জেলয়া সদর দফতর ও একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা। তালিমী বোর্ডকে সম্প্রসারিত করে সবগুলো মাদরাসাকে অধিভুক্ত করা। সানাবীয়া ও মুতাওয়াসসিতায় বোর্ড পরীক্ষা চালু করা। মানব সম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং কেন্দ্রীয় ইয়াতীম খানায় সানাবিয়া পর্যন্ত কোর্স ও ইয়াতীমদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স চালু করা। প্রত্যেক জেলায় খাওয়াতীন শাখা গঠন ও নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ করা। প্রত্যেক জেলায় নিয়মিত কোর্সভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম চালু করা এবং শুব্বানকে মানব সম্পদে পরিণত করার মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। বৃহত্তর ঐক্য স্থাপনে আহলে হাদীস সালাফী সকলকে জমঈয়তের পতাকাতলে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখে নবীনরা। ইনশা-আল্লাহ, জমঈয়তের নবগঠিত কমিটি আশা করা যায় নবীনদের এসব স্বপ্নপূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। আমরা এ আশাবাদ পোষণ করছি এবং আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করছি। আমীন॥ ❑❑

দু'আ-নিয়মাবলী ও সঠিক সময়

(৫ পৃষ্ঠার পর থেকে)

৫. নিজের অপারগতা ও অভিযোগ কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট তুলে ধরবে।

৬. দু'আ করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনমূলক তথা শরীয়ত বিরোধী কিছু করবে না।

৭. দু'আ কবুলের উপযোগী সময়গুলোতে বেশি করে দু'আ করার চেষ্টা করা- যেমন : সিজদারত অবস্থায়, আযানের সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যখানে, গভীর রাতে, জুমার দিনের বিকেল বেলায়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, ইফতারের সময়, কদরের রজনীতে, আরাফার দিবসে, ফরয সালাতের পর, রাতে নিদ্রা থেকে ওঠার সময় এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ দ্বারা দু'আ করবে।

যাদের দু'আ কবুল হয়েই থাকে : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ "

তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হবে না (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) সিয়াম পালনকারী যতক্ষণ সিয়াম পালন করা অবস্থায় থাকে এবং (৩) নির্যাতিত ব্যক্তি। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চাসনের মর্যাদা দেবেন। তাদের বদ দু'আর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা বলবেন : আমার ইয্যতের শপথ! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করব।[১]

[১] *তিরমিযী হা: ৩৫৯৮*

সূরা আল-ফাতিহা : তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক*

[২৫ তম কিস্তি]

الحمد لله رب العالمين

আল-কুরআনের আলোকে আমরা কেন মহান আল্লাহর প্রশংসা করবো?

আল-কুরআনুল কারীমে সর্বমোট ২৩ বার আলহামদু লিল্লাহ উল্লেখ হয়েছে। আর আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন উল্লেখ হয়েছে মোট ৬ বার। এ ২৩ বার আলহামদু লিল্লাহ'র প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট। সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

১- মহান আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, কেননা তিনি সৃষ্টিকূলের রব ও সবার প্রতিপালনকারী। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[২]

যেহুতু মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকূলের প্রতিপালক ও সকলের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও অস্তিত্বদানকারী এবং রেযেকদাতা, সুতরাং সব গুণগান, গুণকীর্তন ও প্রশংসা তো তাঁরই হবে।

আয়াতে উল্লেখিত 'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম' মানে জগৎ। কোন কোন তাফসীরকারক যেমন আল্লামা যামাখশারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ আল কাশশাফে বলেন, 'আলাম' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায়। এই মহাবিশ্বের ও সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ যেহেতু এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক, এজন্য সৃষ্টিজগতকে আলাম এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয়। এর আরেকটি বহু বচন রয়েছে আর সেটি হলো আওয়ালেম। এটি আকলহীন প্রাণী জগতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের সংখ্যা অনেক অনেকগুণ বেশি হলেও মহান আল্লাহ মানব জাতি, জ্বিন ও ফেরেশ্তা জাতির গুরুত্ব ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আলামীন ব্যবহার করেছেন। 'আলামীন' বলতে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ও উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুকেই বুঝায় যা অন্য এক আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে,

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾

ফির'আউন বললঃ রব্বুল আলামীন কী? মূসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দুটির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব।[৩] আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়নি। মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত-এ জগতসমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নেই, বরং এগুলো অসীম জগতের কয়েকটি ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয়।

জগতসমূহের বিশালতা কুলকিনারাহীন। বিজ্ঞানও এর সামান্যই জানতে পেরেছে। কিন্তু এমন আরো অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই জানে না। একটু ধারণা দেওয়া যেতে পারে প্রাণী প্রজাতীর সংখ্যা সম্পর্কে। বিজ্ঞানিদের নানা হিসাব মোতাবেক এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা ৩০ লাখ থেকে ৩ কোটি, তন্মধ্যে শ্রেণিবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে ১৪ লক্ষ, যার মধ্যে প্রায় ২,৫০,০০০ উদ্ভিদ, ৭,৫১,০০০ কীটপতঙ্গ, ৪১,০০০ মেরুদণ্ডী এবং বাকিরা অন্যান্য অমেরুদণ্ডী, ছত্রাক, শৈবাল ও অণুজীব। ২০১১ সালের আগস্টে জার্নাল PLOS Biologyতে প্রকাশিত গবেষণা মতে শুধুমাত্র সমুদ্রেই সর্বশেষ ২২ লাখ প্রাণী প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৩০ কোটি কিউবিক মাইল বিশাল এই জলরাশির শুধুমাত্র বালিন তিমি পরিবারের সদস্য একটি। সেই তিমির ওজন এক লাখ পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে, যা লম্বায় ৬০ ফুট। এমন একটি তিমি সারা দিনে প্রস্রাবই করে ১৬৬ গ্যালন

* সিনিয়র কর্মকর্তা- রাজকীয় সৌদী দূতাবাস, ঢাকা।

[২] সূরা ফাতিহা আয়াত: ২

[৩] সূরা আশ-শু'আরা আয়াত: ২৩-২৪

পর্যন্ত।[৪] একই সূত্র মতে, একটা ফিন তিমি ৮৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং যার ওজন ১ লাখ ৬০ হাজার পাউন্ড। এ প্রজাতির তিমি দৈনিক ২৫৭ গ্যালন প্রস্রাব করতে পারে। যদি এমন কোটি কোটি গ্যালনও প্রস্রাব সমুদ্রে করা হয় তবে তা হবে এই বিশাল জলরাশির নিকট কয়েক ফোটার সমতূল্য। এ বিশাল আয়তনের একটা তিমির খাদ্যাভাসও বেশ আয়েশপূর্ণ। সে প্রতিদিন ৩০ মিলিয়ন সামুদ্রিক ক্রিল খেতে পারে, যা রাখার জন্য তিনটা বড় ট্রাক লাগবে। এরা ২২ ফুট লম্বা এক একটা বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চাটি দৈনিক প্রায় ৬০০ লিটার দুধ পান করে থাকে। এ তো গেল সামুদ্রিক মাছের কথা, এবার বিভিন্ন প্রজাতির কিছু পাখি সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়া যাক। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত পাখির প্রজাতি প্রায় ১০ হাজার। সবচেয়ে ছোট পাখিটির নাম হামিং বার্ড, আর পাখির জগতে বর্তমানে সবচেয়ে বৃহৎ পাখি হল উট পাখি, যেটি প্রায় ৯ ফুট। অন্যান্য প্রাণীর মতোই নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই পাখির জগৎ।

কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এরশাদ করেছেন :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ﴾

অর্থাৎ তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম।[৫]

মহাকাশে এমন সব সৃষ্টি আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন, যাদের বিশালত্ব আমাদের কল্পনার সীমার বাইরে। আমাদের সূর্য এত বড় যে, এর ভেতরে তের লাখ পৃথিবী ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। সূর্য থেকে মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি ছিটকে বের হয়, যেগুলোর একেকটার আকৃতি কয়েক'শ পৃথিবীর সমান। আর সূর্য তেমন কোনো বড় নক্ষত্রও নয়। এমন সব দানবাকৃতির নক্ষত্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে, যাদের ভেতরে দশ কোটি সূর্য এঁটে যাবে। এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় নক্ষত্রটি পঞ্চাশ কোটি সূর্যের সমান।

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ সৃষ্টি জগতের অসংখ্য সৃষ্টির একমাত্র মালিক এবং প্রতিনিয়ত তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, প্রকৃত অর্থে কেবল তিনিই জানেন, তাঁর সৃষ্ট প্রাণসত্তার সংখ্যা কত। এবং তিনিই তাঁর এ সৃষ্ট জগৎকে একান্ত তাঁরই তৈরি করা নিয়মে পরিচালনা করেন, যা কখনই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হতে পারে না। আর এটাই হছে তাঁর জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন এই অসীম সৃস্টিজগতের একমাত্র রব্ব।

رب العالمين 'রব্ব; শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথপ্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙা-গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'লায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে,

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾

পাঠ করুন, যিনি মহান উচ্চ; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন; এবং যিনি সঠিকরূপে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন"।[৬]

এ আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রব্ব তাকেই বলতে হবে যার মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরী'আত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়- যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-

[৪] *জার্নাল অফ জুলজি কানাডা-২০০৩*

[৫] *সূরা শুআরা আয়াত:* ২৯

[৬] *সূরা আ'লা আয়াত:* ১-৩

প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব্ব তিনিই- যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন।[৭]

'রব্ব' কথাটি দ্বারা বোঝায় সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব'। রব্ব তিনিই যার সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব আছে, যিনি সমস্ত কিছুর পালনকর্তা, সমস্ত মানুষের এবং সমস্ত জিনিসের মালিক। "জগতসমূহ" বলতে বোঝায় সমস্ত সৃষ্টিকুল যার মধ্যে রয়েছে মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, পশুপাখি ও আন্যান্য সবকিছু; যার প্রতিটিকে একেকটি জগত বলা যেতে পারে, যেমন 'ফেরেশতাদের জগত', 'পশুজগত', 'মানবজগত' বা 'জ্বিনজগত'। এটা ছোট বড় সব ধরনের সৃষ্টির ব্যাপারেই বলা যায়; যেমন ব্যাকটেরিয়া বা কোষেরও নিজস্ব জগত আছে। বেশির ভাগ সময়ই আমরা আল্লাহর সৃষ্টির এ বিশালতা ও ব্যাপকতা অনুধাবন করতে অক্ষম।

২- যালিমদের সমূলে উৎপাটন করার প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত করা হল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।[৮]

জুলুম একটি বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো নির্যাতন, নিপীড়ন বা অবিচার। সাধারণ অর্থে কাউকে অন্যায়ভাবে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা যেকোনো পন্থায় অবিচার বা নির্যাতন করাকে জুলুম বলে। তবে জুলুমের সবচেয়ে উত্তম সংজ্ঞা হলো,

وضع الشيئ عند غير محله .

কোনো কিছুকে তার নিজস্ব স্থান বাদ দিয়ে অন্য কোনো অপাত্রে ও অমর্যাদাকর স্থানে প্রয়োগ করা বা রাখা। এ সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবহ। সব ধরনের জুলুম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জুলুম একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এটি। অন্যের ওপর অন্যায় বা অবিচার করে নিজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে জালিমরা। আপদ-বিপদ ও দুর্যোগ-বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো জুলুম। তাই আল্লাহ তাআলা সবাইকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। এমনকি আল্লাহ নিজের জন্যও এটিকে হারাম করেছেন। রাসূল ﷺ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর কথা বর্ণনা করে বলেন,

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا.

'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম কোরো না।'[৯]

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে ন্যায়পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। কল্যাণ ও ন্যায়পন্থা হলো মানবজীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ন্যায়পন্থা, অনুগ্রহ ও নিকটাত্মীয়দের হক প্রদানের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে নিষেধ করেন।'[১০]

মানুষের অধিকার হরণ করা ও তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা অনেক বড় জুলুম। এ ধরনের জুলুমের কারণে পুরো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। বিত্তবানরা দরিদ্র্য শ্রেণিকে ও ক্ষমতাবানরা সাধারণ লোকের প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নির্যাতন, নিপীড়ন করে। ফলে একসময় জালিম বা অন্যায়কারীর জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ-আপদ। যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং প্রাপ্য অধিকার

[৭] *সূরা ফুরকান আয়াত: ২*
[৮] *সূরা আনআম আয়াত: ৪৫*
[৯] *সহীহ মুসলিম হা: ৬৭৩৭*
[১০] *সূরা নাহল আয়াত : ৯০*

থেকে বঞ্চিত করে তাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।'[১১]

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জুলুমের ব্যাপারে মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে।'[১২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জালিমরা কখনো সফলকাম হয় না।'[১৩]

জুলুমের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। জুলুম এমন একটি অন্যায় কাজ, যার শাস্তি আল্লাহ তাআলা ইহকালেও দিয়ে থাকেন। জালিমের বিচার শুধু কিয়ামতের দিবসেই হবে না, বরং দুনিয়া থেকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের জুলুমের প্রতিদান দেওয়া শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দুটি পাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ায়ও দিয়ে থাকেন। তা হলো, জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি।'[১৪]

সমাজে বিরাজমান অত্যাচার-অনাচার ও বিশৃঙ্খলা-অস্থিরতার মূল কারণ হলো জুলুম। একে অপরের ওপর নানা রকম অবিচারের ফলে আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর এ বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'জল ও স্থলভাগে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা মানুষের কর্মের ফলস্বরূপ।'[১৫]

মজলুম বা নিপীড়িতের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই মজলুমের অশ্রুফোঁটা ও অন্তরের অভিশাপ পতনের অন্যতম কারণ। মজলুমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জালিমদের ওপর নেমে আসে কঠিন আজাব। তাদের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না। এক. ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া। দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। তিন. মজলুমের দোয়া। আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া মেঘমালার ওপরে তুলে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেন। মহান রব বলেন, আমার সম্মানের শপথ, কিছুটা বিলম্ব হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব।'[১৬]

রাসূল ﷺ আরো বলেন, 'তোমরা মজলুমের দোয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা মহান আল্লাহ ও তার দোয়ার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।'[১৭]

মহান কোন জালেমকেই ছেড়ে দেননি। পৃথিবীতেও তাদেরকে কঠিন লাঞ্ছনা দিয়েছেন। আর পরকালে তো রয়েছে তাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক জীবন। ফেরআউন, নমরূদ, হামান, আবূ জাহাল, আবূ লাহাব, উৎবাহ শায়বাহ, রাবীয়াহ প্রমুখ জালিম ও অত্যাচারী আল্লাহদ্রোহীদের মহান আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কোন জালেমকেই ছাড় দেননি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

'আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে'।

সুতরাং কোন জালিমের জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পেলেই বলতে হবে আলহামদু লিল্লাহ।

৩- মহাবিশ্ব, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আলো অন্ধকারের মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা চিত্তে আলহামদু লিল্লাহ বলা তাওহীদের দলীল।

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি

[১১] *সহীহ মুসলিম হা: ২৬১৩*
[১২] *সূরা শুআরা আয়াত : ২২৭*
[১৩] *সূরা আনআম আয়াত : ৫৭*
[১৪] *তিরমিযী হা: ২৫১১*
[১৫] *সূরা রুম আয়াত: ৪১*
[১৬] *তিরমিযী হা: ৩৫৯৮*
[১৭] *সহীহ বুখারী হা: ১৪৯৬*

করেছেন। তা সত্ত্বেও কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের সাথে সমতূল্য স্থির করে।[১৮]

আল্লাহর এক রহস্যময় সৃষ্টি আকাশ মাথার ওপর বিস্তৃত ওই যে নীল ও আলোকময় সামিয়ানা, নিবীড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছে এ নিখিল ধরণীকে, তার নাম আকাশ। মহান আল্লাহ তা'আলার অজস্র সৃষ্টির মধ্যে এ এক রহস্যময় ও বিশাল সুউচ্চ সৃষ্টি। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার মুগ্ধতাই অন্যরকম।

খুঁটিহীন এ আকাশের দিকে তাকালে মনের গহিনে যখন প্রশ্ন উঁকি দেয়, কে সেই মহান কারিগর? কী অসীম কুদরতের অধিকারী এই মহান স্রষ্টা। শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় একটা সিজদা দিতে মনটা ব্যাকুল হয়ে যায় এ মহামহিয়ান মহান আল্লাহর প্রতি।

যে এ খুঁটিহীন বিশাল আকাশকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আপন কুদরতে? তখন মনের গহিনে অদৃশ্য শব্দরা ঘোষণা করে- এ সুনিপুণ আকাশ, সে তো মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তা'আলা সে কথাই বলেছেন, 'আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপর মজবুত সপ্ত আকাশ।'[১৯]

﴿الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ﴾

যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

এ নিখিল জাহানে আল্লাহ তা'আলা যত রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছেন, আকাশ যেন সেসব রহস্যের মেগা রহস্য। এর রহস্যের শেষ কোথায় তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ সপ্তস্তর বা সাত আকাশের পুরুত্ব ও দূরত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ধারণা, এ সপ্তাকাশের প্রথম স্তরের পুরুত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। দ্বিতীয় আকাশের ব্যাস ১৩০ হাজার আলোকবর্ষ, তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে, ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের আর সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত।

আকাশ শুধু রহস্য দিয়েই ছাওয়া নয়, আকাশের রয়েছে অনন্য সৌন্দর্য্যও। সেই সৌন্দর্যের বিমুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে উদাসী চিত্তকে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾

আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।[২০]

আকাশ মানেই মেঘেদের অবাধ বিচরণ। শুধু মেঘ আর মেঘ। পাল তোলা নৌকার মতো আকাশ দাপিয়ে বেড়ানো এ মেঘমালা এনে দেয় স্বস্তির আবেশ। আকাশের প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সন্ধ্যালগ্নে। সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের সাত রং পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়লে যে মোহনীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, সে সৌন্দর্যের যথাযথ বর্ণনা করে সাধ্য কার? সৌন্দর্যময় এ আকাশের সৌন্দর্যের কি শেষ আছে? দিনে এর এক রকম সৌন্দর্য, তো রাতে আরেক রকম সৌন্দর্য। দিবসের নীল আকাশ নির্জন রজনীতে সাজে কালো রঙের আবরণে। তখন কালো আকাশের গায়ে জ্বলে ওঠে লাখো-কোটি নক্ষত্রের রুপালি আলো।

আকাশের গায়ে প্রজ্বলিত নক্ষত্র রাতের আকাশকে করে আরও সৌন্দর্যময় আর চাঁদের নির্মল আলোয় হয়ে ওঠে আকাশের এ রূপ-রহস্যের মধ্যে চিন্তাশীলদের মনের খোরাকও। বিশাল এ আকাশের নান্দনিকতা, নিপুণতা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা এর পরতে পরতে যে রয়েছে তার অসীম কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন। পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহর যিকির করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়- হে আমার প্রতিপালক! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্রতম।'[২১] **(বাকী অংশ ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

[১৮] *সূরা আনআম আয়াত: ১*
[১৯] *সূরা নাবা আয়াত: ১২*
[২০] *সূরা মুলক আয়াত: ৫*
[২১] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৯০-১৯২*

আল-কুরআন গবেষকের গুণাবলী

-প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

গবেষণা মানে অন্বেষণ বা বিশেষ দৃষ্টিতে খোঁজ করা। যিনি এ কাজটি সম্পাদন করেন তিনিই গবেষক। যিনি গবেষণা করেন, সত্যানুসন্ধান করেন, কোন বিষয়ের ওপর পদ্ধতিগত অনুসন্ধান ও অনুধ্যান করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের লক্ষ্যে যিনি অনুসন্ধান করেন তিনিই গবেষক। গবেষক তিনিই যিনি হবেন জ্ঞানপিপাসু, জ্ঞানপূজারী, অধ্যাবসায়ী, সময়ানুবর্তী, অনুধাবনকারী, সত্যানুসন্ধানী, অনুসন্ধিৎসু এবং নতুন জ্ঞান আবিষ্কারক। বিভিন্ন অভিধানে গবেষকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

১. নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের লক্ষ্যে যিনি অনুসন্ধান করেন।

২. কোন বিষয়ের ওপর পদ্ধতিগত অনুসন্ধান ও অনুধ্যান করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩. বিধি-বদ্ধ নিয়মানুসারে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োজিতকারীই প্রকৃত গবেষক।

আল-কুরআন গবেষকের অপরিহার্য গুণাবলী

ইসলাম উদার ধর্ম। এ ধর্মের গ্রন্থ আল-কুরআন সকল জাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ। তাই কুরআন গবেষণার দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত। তাই বলে এ ধর্মের গ্রন্থ কুরআন নিয়ে যেই সেই গবেষণা করবে এটা হতে পারে না। তবে মুসলিমরা যেহেতু কুরআনে বিশ্বাসী তাই তাদের ওপরেই কুরআন গবেষণার দায়িত্ব। যিনি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করতে চান তাকে বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। যেমন-

ক. আল-কুরআন গবেষকের ধর্মীয় গুণাবলী

১. মুসলিম হওয়া (ان يكون مسلما) : কুরআন গবেষককে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অন্যথায় তার গবেষণায় স্রষ্টাবিরোধী বিষয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

২. নিয়্যাত সহীহ হওয়া (صحة النية) : কারণ হাদীস শরীফে এসেছে, সকল কর্মের ফলাফল নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। হাদীস শরীফে এসেছে, **إنما الأعمال بالنيات** সুতরাং ব্যক্তি নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাবে।[২২]

৩. আকীদা সহীহ হওয়া (صحة الاعتقاد): কুরআন গবেষককে শুধু মুসলিম হলে চলবে না, মুসলিম হিসাবে তার আকীদা-বিশ্বাস হতে হবে নির্ভেজাল। অন্তরে আকীদা-বিশ্বাস সঠিক না হলে গবেষণার ফল বিপর্যয় ঘটবে। বিশেষ করে যদি সে গবেষণা হয় আকীদা-বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিধি-বিধান বিষয়ক। ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী মুফাসসির কুরআনের তাফসীরে বাতিল মাযহাবের পক্ষে আয়াত ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। অন্যথায় সে আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ভুল আকীদা প্রচার করতে পারে, যেমন খারেজী সম্প্রদায় করে থাকে।[২৩]

৪. মুত্তাকী হওয়া (أن يكون متقيا) : গবেষককে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। গবেষকের মাঝে তাকওয়া না থাকলে কুরআন গবেষণায় যাচ্ছে তাই করতে পারবে।

৫. ইখলাস থাকা: কুরআন গবেষণায় গবেষকের মাঝে অবশ্যই ইখলাস থাকতে হবে। গবেষকের মাঝে ইখলাস না থাকলে কুরআন গবেষণা সঠিক হবে না।

৬. সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া (متبع السُّنَّة) : গবেষককে সুন্নাতে পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। অর্থাৎ তাকে সুন্নাত দ্বারা কুরআনের তাফসীর করতে হবে। কেননা সুন্নাত কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী।

৭. সাহাবাদের কথা গ্রহণ করা (رجوع إلى أقوال الصحابة): গবেষককে সাহাবাদের কথার আলোকে তাফসীর করতে হবে। কেননা তাঁরা কুরআন নাযিলের সময় রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

---

* ***অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান-*** *আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও* ***উপদেষ্টা-*** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[২২] *ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী বৈরূত:দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি., খ.৮, পৃ.২৪৬*

[২৩] *মান্না'উল কাত্তান, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২১/২০০০, পৃ. ৩৪০; সেরা তাফসীর সেরা মুফাস্সির, গবেষণা প্রবন্ধ সংকলন, শতাব্দী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৫৯*

৮. তাবেঈদের কথা গ্রহণ করা (رجوع إلى أقوال التابعين): গবেষককে তাবেঈদের কথা গ্রহণ করতে হবে। কেননা তারা সাহাবীদের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। যেমন- মুজাহিদ ইবনু জুবায়ের, সাঈদ ইবন জুবায়ের, ইকরামা ইবনু আব্বাস, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদা ও হাসান বসরী প্রমূখ তাবেঈর কথার দ্বারা তাফসীর করতে হবে।

৯. কুরআন দিয়ে কুরআন বুঝা: কুরআনকে কুরআন দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কোন একটি বিষয় এক স্থানে অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত হলে অন্য জায়গায় তা স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যেমন এক স্থানে 'যুলুম'[২৪] বলা হয়েছে তো অন্যস্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'শিরক'[২৫] বলে।

১০. কুরআন গবেষণায় হাদীস উপস্থাপন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইবাদত তথা সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং মু'আমালাত তথা ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন সামাজিক বিষয়াদিসহ অনেক বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়। কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত কোন বর্ণনা কুরআনে পাওয়া যায় না। এর সবকিছুই আমাদেরকে নিতে হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ দায়িত্বও অর্পণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে, অর্থ: স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থাবলীসহ আপনার উপর নাযিল করেছি কুরআন। যাতে মানুষের ওপর নাযিলকৃত বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং তারা গবেষণা করে।'[২৬]

১১. কুরআন গবেষণায় সাহাবীগণের বক্তব্য উপস্থাপন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন নাযিলের সময় সাহাবীগণ ছায়ার মত তাঁর চার পাশে থাকতেন। তাই তাঁরা কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতেন। কুরআন গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের মতামত উপেক্ষা না করে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উলূমুল কুরআন তথা কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া

আল-কুরআনের গবেষককে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন সম্পর্কীত জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। উলূমুল কুরআন তথা কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান, কতটি এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। কুরআন বুঝা তথা কুরআন বিষয়ক জ্ঞান হলো উলূমুল কুরআন। কুরআন গবেষণায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বিষয়বস্তু হলো- নুযূলুল কুরআনের ইতিহাস, মাক্কী ও মাদানী পরিচিতি, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল, মুহকামাত ও মুতাশাবিহাতসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।

১. আবূ বকর ইবনুল আরাবী ৭৭,৪৫০টি বিষয় উলূমুল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. আল-অহী/ **الوحي** (প্রত্যাদেশ)

২. আল-মুহকাম/ **المحكم** (সুস্পষ্ট)।

৩. আল-মুতাশাবিহ/**المتشابه** (রূপক)।

৪. জামউল কুরআন/**جمع القرآن** (কুরআন সঙ্কলন)।

৫. আসবাবুন-নুযূল/**أسباب النزول** (অবতরণের কারণ)।

৬. তাহফীযুল কুরআন/**تحفيظ القرآن** (কুরআন সংরক্ষণ)।

৭. আল-মাক্কী-ওয়াল মাদানী **المكي والمدني** (মাক্কী-মাদানী)।

৮. নুযূল কুরআন/**نزول القرآن** (আল-কুরআনের অবতরণ)।

৯. আকসামুল-কুরআন/**أقسام القرآن** (আল-কুরআনের শপথ)।

১০. আন নাসিখ/**الناسخ** (রহিতকারী) আল-মানসূখ/ **المنسوخ** (রহিত)।

১১. ইজাযুল কুরআন/**إعجاز القرآن** (আল-কুরআনের অলৌকিকতা)।

১২. তারতীবুল আয়াত ওয়াস-সূরা/ **ترتيب الآية و السورة** (আয়াত ও সূরার ক্রমবিন্যাস)।

১৩. আমসালুল কুরআন **أمثال القرآن** (আল-কুরআনের উপমা) ইত্যাদি। (আল ইতকান)

১. আবুল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব নাইসাপুরী নিম্নের ২৫টি বিষয় উলূমুল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন-

১. মুজমাল আয়াত।

২. মুফাসসাল আয়াত।

৩. ইঙ্গিতবহ আয়াত।

৪. দিনে অবতীর্ণ আয়াত।

[২৪] *সূরা আন'আম আয়াত: ৮২*
[২৫] *সূরা লুকমান আয়াত: ১৩*
[২৬] *সূরা নাহল আয়াত: ৪৪*

৫. জুহফায় অবতীর্ণ আয়াত।

৬. তায়েফে অবতীর্ণ আয়াত।

৭. হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ আয়াত।

৮. মাক্কী সূরাসমূহে মাদানী সূরা।

৯. মাদানী সূরাসমূহে মাক্কী সূরা।

১০. বিস্তারিত হুকুম সম্বলিত আয়াত।

১১. একাকী অবস্থায় অবতীর্ণ আয়াত।

১২. বায়তুল মাকদিসে অবতীর্ণ আয়াত।

১৩. মক্কা থেকে মদীনায় বহনকৃত আয়াত।

১৪. মদীনা থেকে মক্কায় বহনকৃত আয়াত।

১৫. মাদানী হুকুমসম্বলিত মক্কাবতীর্ণ আয়াত।

১৬. মাক্কী হুকুমসম্বলিত মদীনাবতীর্ণ আয়াত।

১৭. মদীনা থেকে আবিসিনিয়ায় বহনকৃত আয়াত।

১৮. মদীনাবাসীদের সম্পর্কে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত।

১৯. মক্কাবাসীদের সম্পর্কে মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত।

২০. নাযিলের সময় ফেরেশতাবেষ্টিত অবস্থায় অবতীর্ণ আয়াত।

২১. সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত মাক্কী সূরা নাযিলের ধারাবাহিক বর্ণনা।

২২. সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত মাদানী সূরা নাযিলের ধারাবাহিক বর্ণনা।

২৩. মাদানী আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের মক্কায় অবতরণ।

২৪. মাক্কী আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের মদীনায় অবতরণ।

২৫. অবতরণের স্থান সম্পর্কিত মতভেদের জ্ঞান ইত্যাদি। (আল-বুরহান)

গ. আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীর মতে আল-কুরআনের গবেষককে **১৫** ধরনের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হতে হবে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হল :

১. কুরআন গবেষণায় কুরআন দ্বারা রেফারেন্স (بالقرآن) প্রদান : কুরআন গবেষণায় গবেষককে কুরআনের আয়াত দ্বারা রেফারেন্স দিতে হবে।

২. কুরআনের গবেষণায় হাদীস দ্বারা রেফারেন্স (بالحديث) প্রদান : কুরআন গবেষণায় গবেষককে হাদীস দ্বারা রেফারেন্স দিতে হবে।

৩. কুরআনের গবেষণায় সাহাবীদের কথার দ্বারা রেফারেন্স (بأقوال الصحابة) প্রদান : কুরআন গবেষণায় গবেষক কুরআন ও হাদীসে না পেলে সাহাবীদের আছারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। হাদীসেও যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সাহাবীগণের উক্তির অনুসন্ধান করবে, তাঁরা সে সম্পর্কে কী বলেছেন। কারণ তাঁরাই ছিলেন কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। তাঁরাই ছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামা'আত। জ্ঞান গভীরতায় এবং আমল আখলাক সার্বিক দিক থেকে। যেহেতু তাঁরা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। কোন আয়াত কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কেন নাযিল হয়েছে সবই তাঁরা জানতেন।

৪. কুরআনের গবেষণায় তাবেঈদের কথার দ্বারা রেফারেন্স (بأقوال التابعين) প্রদান : কুরআন গবেষণায় গবেষককে প্রসিদ্ধ তাবিঈগণের অভিমত দিয়ে রেফারেন্স দিতে হবে।

৫. কুরআনের পঠনরীতি সম্পর্কীয় জ্ঞান থাকা (علم القراءات): কুরআনের পঠনরীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ এর দ্বারা কুরআনের বিভিন্ন উচ্চারণ রীতি জানা যায়। এর বিভিন্নতার জ্ঞান কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৬. আয়াত অবতরণের পেক্ষাপট সম্পর্কীয় জ্ঞান (علم أسباب النزول) : কুরআনের গবেষককে আয়াত অবতরণের পেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ এর দ্বারা আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট জানা যায়।

৭. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগতি হওয়া (علم القصص): ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

৮. রহিতকারী ও রহিত আয়াত সম্পর্কীয় জ্ঞান (علم الناسخ والمنسوخ): রহিতকারী ও রহিত আয়াত সম্পর্কীয় জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কিছু

আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে। শারঈ আইন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য এরূপ হয়। তাই কোন আয়াত রহিত এবং কোন আয়াত রহিতকারী সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. কুরআনের দুর্বোদ্ধতা সম্পর্কে জানা (علم غرائب القرآن) : কুরআনের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কুরআনের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তাফসীর করা দুরূহ হবে।

১০. ভাবব্যঞ্জনা ও রচনাশৈলীর অধিকারী হওয়া (أسلوب القرآن): আল কুরআনের রচনাশৈলী ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। তাই মুফাসসিরের তাফসীরের করার পূর্বে সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকিবহাল হতে হবে।

১১. কুরআনী হিদায়াতের উপলক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া (هداية القرآن) : জাহিলী সমাজে কুরআন মানব কল্যাণে যে প্রেক্ষাপটে হিদায়াত প্রদান করেছে, সে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

১২. মুজমাল ও মুবহাম বিষয়ক জ্ঞান:

(علم الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم) মুজমাল ও মুবহাম তথা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর করার ক্ষেত্রে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা।

১৩. নবী ﷺ ও সাহাবাগণের জীবন চরিত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া (سوانح الأنبياء و الصحابة) : একজন মুফাসসিরকে নবী ﷺ ও সাহাবাগণের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা দরকার।[২৭]

১৪. আয়াত সম্পর্কে সম্যক অভিহিত থাকা : পূববর্তী ও পরবর্তী অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে সম্যক অভিহিত থাকতে হবে।

১৫. মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষমতা থাকা: আল-কুরআন থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষমতা থাকতে হবে।

এছাড়াও তাঁর মতে জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করা তার পক্ষে উচিৎ হবে না।

[২৭] *রশীদ রিযা পূর্বোক্ত, পৃ.২১-২৪।*

সূরা আল-ফাতিহা : তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা

(১৫ পৃষ্ঠার পর থেকে)

এত চিত্তাকর্ষক আকাশ ও দৃষ্টিনন্দন এ বসুন্ধরার মাঝেও রয়েছে মহান আল্লাহর একত্ববাদের অসংখ্য দলীল - আদিল্লাহ।

আল্লাহর গুণাবলী ও পরিচয় পাওয়া যায় এসব বিশাল সৃষ্টির মাঝে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় প্রদানে কিছু নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন। এসব প্রমাণ এতটাই অকাট্য এবং যুক্তিপূর্ণ যে, এর বিরোধিতা করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় প্রদানে কুরআনে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। যা ইয়াহুদি-নাসারা, পৌত্তলিক ও মুশরিকদের সকল প্রশ্নকে ভিত্তিহীন করে দেয়। এসব প্রমাণ উপস্থাপন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং মানবজাতীর উপকারার্থে সমুদ্রবক্ষে জাহাজসমূহের চলনে এবং আসমান থেকে আল্লাহ তা'আলা যে বারি (পানি) বর্ষণ করছেন তাতে, যা দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং জীব-জন্তুকে যে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে এবং বায়ুর যাতায়াত করাতে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে মেঘমালার গমনাগমনে সত্যিই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে বহু জ্বলন্ত নিদর্শন রয়েছে।'[২৮] পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার পরিচয় প্রদান করেন। যেখানে তিনি ইয়াহুদি-নাসারাদের ভুল ধারণা নিরসন করেন।

মহামহিম আল্লাহ তা'আলা অনিন্দ্য, অপরূপ এ ভূমন্ডল, নভোমন্ডল, আলো, অন্ধকার, চাঁদ- সূর্য, গ্রহ -নক্ষত্র সৃষ্টি করে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই কেবল আমাদের মা'বূদে বারহক। আসুন আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের রব্বে করীমকে স্মরণ করি ও প্রফুল্লচিত্তে বলি আলহামদু লিল্লাহ।

[২৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৬৪*

ঈদে মিলাদুন্নাবীর বাস্তবতা ও কুরআন-সুন্নাহ'র ফায়সালা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

"ঈদে মিলাদুন্নাবী" এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদির ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যায় প্রাক ইসলামী যুগেও এ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল, যেমন- গ্রীক, ইউনান, ফিরায়ানা ইত্যাদি সভ্যতায় তারা স্বীয় দেবতার অনুষ্ঠান উদযাপন করত। তাদের থেকে গ্রহণ করেছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। যাদের কাছে বড় ঈদ হলো তাদের নবীর জন্মোৎসব পালন করা। খ্রীষ্টানদের জন্মোৎসব বা বড় দিবসের অনুষ্ঠান শুধু প্রাকইসলামেই পালন করা হত না বরং আজও হয়ে চলছে। সেখান থেকেই অনুসৃত হয়ে এসেছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মাঝে। এখন প্রশ্ন হলো, কখন থেকে মুসলিম সমাজে এ কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটল এবং কার মাধ্যমে ঘটল?

ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন কখন থেকে ?

ঈদে মিলাদুন্নাবী এর পক্ষে ও বিপক্ষে সকল আলিম একমত যে, এই মিলাদুন্নাবীর উৎসব নাবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের মাধ্যমে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে অবশ্যই সে উত্তম যুগ সমূহ অতিবাহিত হওয়ার পরই এ বিদআতের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কোন্ সময় এবং কার মাধ্যমে এ বিদআতের উদ্ভব ঘটল এ নিয়ে ইসলামী গবেষকগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন।

এক: হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরে ফাতেমী সাম্রাজ্যে এ বিদআতের উদ্ভব ঘটে। তারা সর্বপ্রথম ছয় জন ব্যক্তির জন্মোৎসব পালন করেন। (১) নাবী ﷺ (২) আলী رضي الله عنه (৩) হাসান رضي الله عنه (৪) হুসাইন رضي الله عنه (৫) ফাতেমা رضي الله عنها (৬) তৎকালীন ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের খলীফা। তখন হতে ফাতেমী বা শিয়া সম্প্রদায়ের খলীফা স্বউদ্যোগে জাতীয়ভাবে ছয় জনের জন্ম দিবস পালন করতেন।[২৯]

দুই: হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরাকের মাওসুল শহরে তৎকালীন বাদশা আল মুযাফফার এর পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী আলেম ওমার বিন মুহাম্মদ মল্লা এর পরিচালনায় সর্ব প্রথম নাবী ﷺ-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[৩০]

ইমাম আবূ শামাহ রহ. উক্ত দু'টি মতের সমন্বয় সাধন করে বলেন: বস্তুত সর্ব প্রথম যারা এ বিদআতের উদ্ভব ঘটায় তারা হলো ফাতেমী বা শিয়া সম্প্রদায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা মিশরের রাজধানী কায়রোতে এ বিদআতের উদ্ভব ঘটায়। অত:পর সেখান থেকে ফাতেমী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাকের মধ্যে মাওসুল শহরে সর্বপ্রথম বাদশা মুযাফ্ফার এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিদআত চালু হয়। যদিও অন্যাঞ্চলে তা আগেই উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু ইরাকের মাওসুল শহরে তার মাধ্যমেই প্রথম চালু হয়।[৩১]

একটু চিন্তা করুন:

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, যে কাজটি নাবী ﷺ-এর যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না, এমনকি তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও প্রসিদ্ধ ইমামদের যুগেও ছিল না, তা কিভাবে ইসলামের ইবাদত হতে পারে? সত্য ইতিহাস প্রমাণ করে এ বিদআতের উদ্ভব হলো নাবী ﷺ-এর পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার চারশত বছরেরও অনেক পরে। তাই বিদআতের সঠিক মাপকাঠিতে ফেলে একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহা একটি সুন্নী মুসলিমদের আজীবন শত্রু ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় হতে উদ্ভাবিত এক ভ্রান্ত গুমরাহি বিদআত যা নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের আমলে ছিলনা। আসুন আমরা এ প্রচলিত বিদআত-নাবী ﷺএর জন্মবার্ষিকী প্রচলন উপলক্ষে যে সব গর্হিত ও ইসলামে

❖ অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

[২৯] *[দ্রঃ আল খিতাত লিল মাকরীযী- ১/৪৯০-৪৯৯*

[৩০] *হাসনুল মাকসাদ লিসযুয়ূতী ঃ ৪২ পৃষ্ঠা*
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ১৩/১৪৭ পৃষ্ঠা

[৩১] *আল-বায়িছ লিআবী শামাহ ঃ ২৩-২৪ পৃষ্ঠা, বিস্তারিত দ্রঃ আল আইয়াদ ওয়া আছারুহু আলাল মুসলিমিন ২৮৬-২৮৯ পৃষ্ঠা*

নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয় তার সামান্য কিছু অবগত হই এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নেই।

ঈদে মিলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে যা হয়ে থাকে:

আমরা অবগত হলাম ঈদে মিলাদুন্নাবী ইবাদতের নামে এক নব উদ্ভাবিত বিদআত। কিন্তু ইহা কী শুধু বিদআতের সীমায় সীমাবদ্ধ না, একে কেন্দ্র করে আরো কিছু হয়ে থাকে? উত্তরে নির্বিঘ্নে বলতে পারি যে, ইহা শুধু বিদআতের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং একে কেন্দ্র করে মানুষ লিপ্ত হয় পৃথিবীর বুকে সর্বনিকৃষ্ট ও জঘন্যতম অপরপাধ-শিরকে, যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে অংশী স্থাপনের অপরাধ ক্ষমা করেন না, আর এ অপরাধ ছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।"[৩২] ইহা শুধু অপরাধ বলেই গণ্য হয় না বরং এ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার অতীতের সর্বপ্রকার সৎকর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং সে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

"আর যদি তারা শিরকে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের অতীতের সব আমল বিনাশ হয়ে যাবে।"[৩৩] নাবী ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী পালনে মানুষ এমন কর্মে লিপ্ত হয় যা প্রকাশ্য শিরক যেমন- তাদের বিশ্বাস হলো, নাবী ﷺ মানব নন তিনি নূরের তৈরী, তিনি গায়েব জানেন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত হয়ে থাকেন, এমন কি সে দিশেহারা নির্বোধেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছেই তাদের ফরিয়াদ পেশ করে, তাঁর কাছে সাহায্য সহযোগিতা তলব করে, ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে নাবী ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এ দিশেহারা ভ্রান্তদের অবস্থা কি সেই ভ্রান্ত খ্রীষ্টানদের মত নয়? যারা তাদের নাবী ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সমপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। তাইতো শুরুতেই বলেছিলাম যে, খ্রীষ্টানেরা তাদের নাবীর জন্মবার্ষিকী পেয়েছে ইউনান গ্রীকদের কাছ থেকে, আর এ শ্রেণীর মুসলিমরা তাদের নাবীর জন্ম বার্ষিকী পেয়েছে সেই ভ্রান্ত খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে, যার শেষ রূপ খ্রীষ্টানদের ঈসা আ. কে মাবুদ বানানোর মতই হয়ে গেছে। এ জন্যই নাবী মুহাম্মদ ﷺ চৌদ্দশত বছর পূর্বেই স্বীয় উম্মতকে সতর্কবাণী করে গেছেন, তিনি ﷺ বলেন:

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

"তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা, যেমন খ্রীষ্টানেরা ঈসা ইবনু মারয়াম এর ব্যাপারে (তাকে মাবুদের পর্যায় পৌঁছিয়ে) বাড়াবাড়ি করেছে, আমি কেবলমাত্র তাঁর একজন বান্দা (আল্লাহর দাস)। অতএব তোমরা আমাকে বল- আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[৩৪]

এ ছাড়াও সে সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে যে নাত, ছন্দ ও ছড়া আবৃত্তি করা হয়, যেগুলোর অনেকাংশ শির্কি কথা বার্তায় পৌঁছে যায়, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছেনা। অনুরূপ ঈদে মিলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে মাযার ও দরগাসমূহে যে সব ওরোসের আয়োজন হয়ে থাকে, সে গুলোতে গর্হিত কার্যকলাপই ভরপুর, সেখানে গাঁজাখোরদের আড্ডা, গান বাজনার আসর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি। একজন ধর্মপ্রিয় বিবেকবান ব্যক্তির কাছে আর বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা, কিভাবে এ গর্হিত কাজ ইসলামের ইবাদাত হতে পারে? কিন্তু সমস্যা হলো সাধারণ মুসিলম তথাকথিত বিদআতী আলিমের ভ্রান্ত বিবৃতির সংশয়ে পড়ে গেছেন। তাই আসুন কিছু সংশয় নিরসনে যাই।

সংশয় নিরসন: আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) "প্রতিটি দলই নিজেকে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল্য"[৩৫] এটাই হলো মানব জাতির স্বভাব, দেখা যায়

[৩২] *সূরা নিসা আয়াত: ৪৮*
[৩৩] *সূরা আনআম আয়াত: ৮৮*
[৩৪] *সহীহ বুখারী হা: ৩৪৪৫*
[৩৫] *সূরা রুম আয়াত: ৩২*

যাদের ধর্মের বিকৃত রূপ ছাড়া সততার কোন বালাই নেই, সেই ইয়াহুদী খ্রীষ্টানেরাও নিজেদের ধর্মের সঠিকতা দাবী করে এবং সাধারণ মানুষকে স্বীয় ধর্মে ভিড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি ঈদে মিলাদুন্নাবীর মত বিদআতকে এক শ্রেণীর মানুষ ইবাদাতে পরিণত করার অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে এবং কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যার সাথে মিথ্যা ও জাল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে সংশয়ে ফেলেছে। আসুন আমরা সে সব অসারতা ও সংশয়ের নিরসনে যাই।

প্রথম সংশয়: নাবী ﷺ-এর মুহাব্বত বা ভালবাসার দোহাই দিয়ে এ সব কাজ করা হয় এবং বলা হয় যে, যারা এ মিলাদ পালন করে না, তারা নাবী ﷺ-কে ভালবাসেন না।

এ সংশয়ের নিরসনে বলতে চাই, নাবী ﷺ-কে ভালবাসার অর্থ কি তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা, না প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দীন পালন করা? সঠিক উত্তর হলো তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো, নাবী ﷺ এ ধরনের আনন্দ, উল্লাস ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করার কোন আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন? এর কোন সঠিক প্রমাণ আছে কি? আদৌও নেই। আরো প্রশ্ন হল তথাকথিত ভালবাসার দাবীদাররা নাবী ﷺ-কে বেশী ভালবাসেন, না সে সব সাহাবায়ে কিরাম যাঁরা তাঁর কথায়, আদেশ নিষেধ পালনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন তারাঁ? উত্তর হল তারাই (সাহাবীগণ) নাবী ﷺ-কে বেশী ভালবেসে ছিলেন, যার কোন তুলনা হতে পারে না।

অতএব সাহাবীগণ এ উম্মাতের সর্বোত্তোম নাবীর ﷺ অনুসারী এবং সর্বোত্তোম নাবী প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কি এ জাতীয় মিলাদ মাহফিলের উদযাপন করেছেন? কখনই না। সুতরাং এসব ভালবাসার দাবী প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কখনও নাবী ﷺ-এর অনুসরণ হতে পারে না। বরং যারা এসব বিদআত বর্জন করে চলেন তারাই প্রকৃত নাবী প্রেমিক এবং তাঁর অনুসারী।

দ্বিতীয় সংশয়: বলা হয় যে, "আবূ লাহাব এর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখলে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন: আমার দাসী শুয়াইবা নাবী ﷺ-এর জন্মের সুসংবাদ দিলে তাঁকে দুধ পানের জন্য আমি তাকে (দাসীকে) আযাদ করে দিই, তাই প্রতি সোমবার আমার জাহান্নামের আযাব হালকা করে দেয়া হয় এবং আমার দু'আঙুলের মাঝ হতে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি।" দাবী হলো আবূ লাহাব একজন কাফির হওয়া সত্ত্বেও নাবী ﷺ-এর জন্মের খবর পেয়ে তার দাসীকে মুক্ত করে দেয়াতে যদি উক্ত প্রতিদান পায়, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যদি নাবীর ﷺ জন্ম দিবস পালন করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বড় ধরনের প্রতিদান রয়েছে।

সংশয় নিরসন: প্রথম কথা হলো, এ ঘটনাটি মুরসাল সূত্রে প্রমাণিত, যা হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী- যয়ীফ বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত এবং দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় কথা হলো, বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আবূ লাহাব তার দাসীকে নাবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের প্রারম্ভে আযাদ করেন, যা নাবী ﷺ -এর জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর।[৩৬] ইহা প্রমাণ করে যে উক্ত দাবি সঠিক নয়। তৃতীয় কথা হলো, কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, আবূ লাহাবের মতো কাফিররা জাহান্নামী হবে এবং তাদের জাহান্নামের আযাব কোন রূপ কম করা হবেনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾

"তাদের জন্য হলো জাহান্নামের আযাব, আর এ আযাব ভোগকালে তাদের কোন মৃত্যুও হবেনা এবং জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য হালকাও করা হবে না। এরূপই আমি প্রতিটি কাফিরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।"[৩৭] আল্লাহ তাআলার কথা হলো কাফিরদের কোন আযাব হালকা করা হবেনা, আর উক্ত ঘটনা প্রমাণ করে আবূ লাহাবের আযাব হালকা করা হবে, সুতরাং উক্ত ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হতে আর কী বাকী থাকে।

---

[৩৬] *দ্রঃ তবাকাত লি ইবনে সা'দ ১/১০৮-১০৯, ও আল ইসাবাহ লি ইবনে হাজার ৪/২৫৮*

[৩৭] *সূরা ফাতির আয়াত: ৩৬*

তৃতীয় সংশয়: সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে নাবী ﷺ-কে সোমবারে সিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ "সোমবারে আমি জন্ম লাভ করেছি এবং সোমবারেই আমি নবুয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি।" ঈদে মিলাদুন্নবীর দাবীদাররা বলেন যে, নাবী ﷺ নিজেই তাঁর জন্ম দিনকে সিয়াম রাখার মাধ্যমে পালন করেছেন, তাই নাবী ﷺ-এর জন্ম দিন পালন করা তাঁর সুন্নাত।

এ অপব্যাখ্যার জবাবে আমরা বলতে চাই প্রথমত: নাবী ﷺ সোমবারকে তার জন্ম দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং সেদিন সিয়াম রেখেছেন, তিনি ১২ ই রবিউল আওয়ালকে জন্ম দিন হিসাবে বলেননি এবং ঐ তারিখে এ উদ্দেশ্যে কোন সিয়াম রেখেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং যারা আজ ১২ই রবিউল আওয়ালকে নাবীর ﷺ জন্ম দিবস হিসাবে পালন করেন এবং ঐ হাদীস এর দলীল পেশ করেন, তারা হয় হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে অজ্ঞ অথবা হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী, প্রবৃত্তির পূজারী ছাড়া কিছুই নন।

দ্বিতীয়ত: নাবী ﷺ সোমবারের সিয়াম শুধু জন্ম দিনের জন্য রাখেননি বরং আরো অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে রাখতেন তিনি বলেন:

«تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ (আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে) উপস্থাপন করা হয় তাই আমার পছন্দ হয় যে, আমি সিয়াম অবস্থায় আমার আমলসমূহ উপস্থাপন করা হোক।"[৩৮] সুতরাং প্রমাণিত হল যে, নাবী ﷺ অন্য কারণেই সোমবার সিয়াম রাখতেন।

তৃতীয়ত: যারা নাবী ﷺ-এর সোমবার জন্ম দিবস হিসাবে সিয়াম রাখার দলীল দিয়ে তাদের কুমতলব হাসিল করতে চান, তাদের বলতে চাই যে, নাবী ﷺ তাঁর জন্ম দিন সোমবার সিয়াম রাখার মাধ্যমে পালন করেছেন? না খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ উল্লাস এবং অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে পালন করেছেন? উত্তর হলো সিয়াম রাখার মাধ্যমে; পক্ষান্তরে সুবিধাবাদী জিন্দাবাদেরা তাঁর বিপরীত। আরো প্রশ্ন হলো নাবী ﷺ কি বছরে শুধু এক দিন উদযাপন করেছেন না প্রতি সপ্তাহে? আরো প্রশ্ন সাহাবায়ে কিরাম কি সিয়াম রাখার মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, না আনন্দ উল্লাস ও খাও-দাও ফুরতি করার মাধ্যমে? সুতরাং নাবী ﷺ-এর সুন্নাত হলো প্রতি সোমবারে সিয়াম রাখা, যদি তর্কের খাতিরে বলতে হয়, তবে এটাই হলো তাঁর জন্ম দিবস উদযাপন। এটাই হলো তাঁর তরীকা। তিনি বলেন: **مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي** "যে আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার মধ্যে নয়।"[৩৯] অতএব তথাকথিত মিলাদুন্নাবী উদযাপনকারীরা কার অনুসারী এবং কার ধর্মে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অপব্যাখ্যাকারীদের ভ্রান্ত সংশয়ে আর ভ্রুক্ষেপ না করে এখন কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্তে যাই।

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা :

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত প্রকটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ পূর্ণতার রূপ দান করেছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী-রাসূল মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করেছেন- সাথে সাথে মানবজাতিকে রাসূলের দেয়া বিধিবিধান পালন করার আদেশও করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।"[৪০]

অতএব, রাসূল ﷺ আমাদেরকে তথাকথিত নব আবিষ্কৃত ঈদে মিলাদুন্নাবী দিয়েছেন এর কোন সঠিক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে তিনি ইবাদাতে নব আবিষ্কার হতে কঠোর বাধা প্রদান করেছেন, সেহেতু আমাদের এ সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকা অপরিহার্য।

---

[৩৮] *জামি তিরমিযী হা: ৭৪৭, সুনান নাসাঈ হা: ২৩৫৮ (সহীহ)*

[৩৯] *সহীহ বুখারী হা: ৫০৬৩*

[৪০] *সূরা হাশর আয়াত: ৭*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা তাঁর (নাবীর) কাজের বিরোধী, তাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যে, তাদেরকে ফেতনায় পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের গ্রাস করবে।"[৪১]

ইমাম ইবুন কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন:

أي عن أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود علي قائله وفاعله كائنا من كان .

"হুঁশিয়ার হওয়া উচিত যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ, পথ ও পদ্ধতি, তরীকা-সুন্নাত ও তাঁর বিধিবিধানের বিরোধিতা করে। আর তাঁর কথা ও কাজই হলো অন্যের কথা ও কাজের মাপকাঠি, যদি তাঁর কথা ও কাজে মিলে যায় তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে, আর যদি বিপরীত হয় তাহলে তা যে এবং যাই হোকনা কেন তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"[৪২]

হাদীসেও পরিষ্কারভাবে এসেছে, সাহাবী ইরবায ইবনু সারিয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রসিদ্ধ হাদীস, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"তোমরা আমার এবং আমার পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়িয়ে ধর। নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে সতর্ক থাক, কেননা সকল নতুন উদ্ভাবিতই বিদআত, আর সকল বিদআতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।"[৪৩] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত"।[৪৪] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ হাদীসই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তথা কথিত ঈদে মিলাদুন্নাবী তাঁর দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা নব উদ্ভাবিত, সুতরাং তা ভ্রান্ত ও গুমরাহী বিদআত যা প্রত্যাখ্যাত। এ হলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত। অনুরূপ সাহাবী তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ী ও প্রসিদ্ধ ইমামগণ- আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কেউই এ ধরনের কোন মিলাদ মাহফিলের আয়োজন তো করেন নি, এমনকি তাদের পক্ষ হতে এর কোন অনুমতি ও সম্মতিও পাওয়া যায়না বরং তাঁদের আকীদা বিশ্বাস, কথা ও কাজই প্রমাণ করে যে, ইহা একটি ভ্রান্ত বিদআত যা অবশ্যই বর্জনীয়। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রকৃত মত।[৪৫] বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বিশ্ব বরেণ্য আলিম আল্লামা শায়খ ইবনু বায রহ. কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: "মিলাদুন্নাবী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা জয়েয নয়, কারণ এসবই ইসলামে নব উদ্ভাবিত বিদআত যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী উত্তম যুগ সমূহের কেউ করেননি, অথচ তারাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের ব্যাপারে অধিক জানতেন এবং তাঁর অধিক প্রেমিক ছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: যে আমাদের দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম) ইত্যাদি। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল উপস্থাপন করেন; যা সবই প্রমাণ করে যে, ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন একটি বর্জনীয় বিদআত।[৪৬]

উপসংহারে বলতে চাই, হে মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। *(বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

[৪১] *সূরা নূর আয়াত: ৬৩*
[৪২] *তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/৩০৭*
[৪৩] *সুনান আবূ দাউদ হা: ৪৬০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান হা: ০৫*
[৪৪] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৭, মুসলিম হা: ৪৫৮৯*
[৪৫] *দ্রঃ আল আইয়াদ ওয়া আছারুহা আলাল মুসলিমিন ঃ ৩৩৩-৩৪৩ পৃষ্ঠা ও আল ইরশাদ ইলা সহীহীল ই'তিকাদ ৩৩২-৩৩৫*
[৪৬] *দ্রঃ আল বিদআ ওয়াল মুহদাছাত ওয়া মা লা আসলা লাহু ৬১৯-৬২৬ পৃষ্ঠা*

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান★

তৃতীয় অধ্যায়–আল কুফর

কুফরের অর্থ–

* **কুফরের আভিধানিক অর্থ:** আবরণ, ঢাকা ও আচ্ছন্ন করা।

* **শরীয়তের পরিভাষায় কুফর** ঈমানের বিপরীতকে বুঝায়।

অতএব, কুফর হলো– আল্লাহ, ফেরেস্তামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান না থাকা।

হাদীসে জিবরীলে নবী ﷺ বলেন, যখন তাঁকে জিবরীল আলাইহিস সালাম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন–

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

অর্থাৎ ঈমান হলো- 'তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল এবং বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি'।[৪৭]

অতএব, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই 'ঈমানের পরিপন্থীই হলো কুফর'।

ঈমানের ছয়টি রুকন তার একটি অস্বীকার করা কুফরী হবে।

কুফরের প্রকারভেদ

কুফর প্রধানত দু প্রকার :

প্রথম প্রকার বড় কুফর যা ইসলাম হতে বের করে দেয়– বড় কুফরেরও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে– যেমন–

১। মিথ্যারোপজনিত কুফর: এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾

অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে আর প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তাঁর নিকট থেকে আসে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নামের ভিতরে নয়?[৪৮]

২। সত্য জানার পরও প্রত্যাখ্যান ও অহঙ্কারজনিত কুফর: এর অন্তর্ভুক্ত হলো ইবলিসের কুফরী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾

অর্থাৎ যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সেজদা করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল।[৪৯]

৩। সন্দেহজনিত কুফর: কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ এ কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا إلى قوله تعالى لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

অর্থাৎ নিজের প্রতি যুল্‌ম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি ধারণা করি না যে, এটা কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়ই, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি পরিবর্তে আরো উৎকৃষ্ট স্থান পাব। কথার প্রসঙ্গ টেনে তার সাথী বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র-কীট হতে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ

★ *দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৪৭] *সহীহ মুসলিম*

[৪৮] *সূরা আনকাবূত আয়াত: ৬৮*

[৪৯] *সূরা বাকারা আয়াত: ৩৪*

দেহসম্পন্ন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন? (আর আমার ব্যাপারে কথা হল) সেই আল্লাহ্ই আমার রব, আমি কাউকে আমার রবের শরীক করব না।[৫০]

৪। উপেক্ষাজনিত কুফর: এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾

(অর্থাৎ) কিন্তু কাফিরগণ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৫১]

৫। মোনাফেকীজনিত কুফরী: এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

অর্থাৎ তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না।[৫২]

৬। ঠাট্টা বিদ্রূপজনিত কুফর: এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

অর্থাৎ বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ।[৫৩]

৭। আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিচার ফয়সালা করা: অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তকে একেবারে বাজেয়াপ্ত বা বাতিল করা, লোকদেরকে শরীয়ত সম্মত বিচার-ফায়সালাতে বাধা দেয়া এবং তার পরিবর্তে মানব রচিত আইনকে প্রবর্তন করা। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।[৫৪]

৮। নামায পরিত্যাগজনিত কুফরী : এর দলীল বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী–

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

অর্থাৎ আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে পার্থক্য হল নামায। অতএব, যে নামায পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।[৫৫]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

অর্থাৎ ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা।[৫৬]

৯। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদত পালনজনিত কুফর : যেমন দোয়া ইত্যাদি ইবাদত অন্যের জন্য সম্পাদন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكافرون﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার রবের কাছেই তার হিসাব হবে, কাফিরগণ অবশ্যই সফলকাম হবে না।[৫৭]

১০। প্রয়োজনে দ্বীনের জ্ঞাত বিষয়কে অস্বীকারজনিত কুফর।

কুফরের দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না-এটি হলো কর্মগত কুফরী। যা এমন গুনাহের অন্তর্ভুক্ত কুরআন ও সুন্নাতে কুফর নামে অভিহিত, তবে বড় কুফরের সীমায় পৌঁছে না। আর সেগুলো নিম্নরূপ–

[৫০] *সূরা কাহফ আয়াত: ৩৫-৩৮*
[৫১] *সূরা আহকাফ আয়াত: ৩*
[৫২] *সূরা মুনাফিকূন আয়াত: ৩*
[৫৩] *সূরা তাওবা আয়াত: ৬৫-৬৬*
[৫৪] *সূরা মায়িদাহ আয়াত: ৪৪*
[৫৫] *আহমাদ, তিরমিযী, নামায়ী ও হাকেম– সহীহ*
[৫৬] *সহীহ মুসলিম*
[৫৭] *সূরা মু'মিনূন আয়াত: ১১৭*

১। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করা: যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহ্‌র নি'য়ামতরাজির কুফুরী করল।[৫৮]

২। মো'মিনের সাথে লড়াই করা: যেমন নবী ﷺ বলেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

অর্থাৎ মুসলিমকে গালি দেয়া গুনাহ আর তার সাথে লড়াই করা কুফরী।[৫৯]

৩। না জেনে বংশ বা রক্ত সম্পর্ক দাবি করা বা তা অস্বীকার করা:

কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ এর বাণী–

كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ.

অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তির কুফরির অন্তর্ভুক্ত হলো, এমন বংশ দাবি করা, যা সে জানে না বা তা অস্বীকার করা, যদিও তা তুচ্ছ হয়।[৬০]

আবূ বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ.

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হলো, বংশীয় সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্নতা দাবি যদিও তা তুচ্ছ হয়।[৬১]

৪। মৌখিকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা: কেননা নবী ﷺ এর বাণী:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করলো, সে অবশ্যই কুফরী বা শিরক করল।[৬২]

৫। বংশের খোঁটা দেয়া ও মৃত্যুতে বিলাপ করা: কেননা আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ .

অর্থাৎ মানুষের মাঝে দু বিষয়ে কুফরী রয়েছে– বংশের খোঁটা দেয়া এবং মৃতের উপর বিলাপ করা।[৬৩]

৬। মুসলমানদের আপোষে ঝগড়ায় একে অপরকে হত্যা করা: নবী ﷺ বলেন–

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থাৎ আমার পর তোমরা একজন অন্যজনের শিরশ্ছেদ করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।[৬৪]

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পরস্পরে লড়াইরত দু' দলকেই মু'মিন অভিহিত করেন, তিনি বলেন–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ মু'মিনদের দু'দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[৬৫]

এবং উভয় দলকে মু'মিনদের ভাই সাব্যস্ত করেন, তাই বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

অর্থাৎ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর।[৬৬]

সুতরাং এগুলো প্রমাণ করে যে, হাদীসে যে কুফরীর উল্লেখ রয়েছে তা ছোট কুফরী। অর্থাৎ বড় কুফরীর চেয়ে ছোট কুফর। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। ***চলবে ইনশা আল্লাহ***

---

[৫৮] *সূরা নাহল আয়াত: ১১২*
[৫৯] *বুখারী ও মুসলিম*
[৬০] *ইবনে মাজাহ– হাসান*
[৬১] *বাযযার– হাসান*
[৬২] *তিরমিযী– সহীহ*
[৬৩] *সহীহ মুসলিম*
[৬৪] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[৬৫] *সূরা হুজুরাত আয়াত: ৯*
[৬৬] *সূরা হুজুরাত আয়াত: ১০*

বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক*

(২৮তম পর্ব)

(গ) علم الغيب বা অদৃশ্যের জ্ঞান সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি :

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের বৃহৎ একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত রয়েছে। বিশেষ করে বেরেলভীরা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল বলে অধিক পরিচিত। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে নিয়ন্ত্রিত। এ জ্ঞান সম্পর্কে কোনো সৃষ্টজীব অবগত নয় কিংবা অবগত থাকাও সম্ভব নয়।

তারপরও বেরেলভী সূফিদের বিশ্বাস হলো সকল নাবী রাসূলগণ, সৎকর্ম পরায়ণ আল্লাহর বান্দা ও ওলী আউলিয়াগণ গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নাবী রাসূল ও ওলী আউলীয়ারা আসমান ও যমীনের সমুদয় অদৃশ্যের খবরাখবর রাখেন। এটা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাস, এর সাথে শরীয়াতের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কালামে মাজীদে এরশাদ করেন:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

হে রাসূল! আপনি বলুন, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য খবরাখবর সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। [৬৭] আল্লাহ আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

আসমান ও যমীনের অদৃশ্যের খবরাখবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন। [৬৮]

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾

আসমান ও যমীনের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে এবং সকল বিষয় তাঁর দিকেই ফিরবে। [৬৯]

আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾

বলুন অদৃশ্যর জগত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর (এবং ভবিষ্যতে কী হয় তা দেখ), নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম। [৭০] আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

সমস্ত অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন কোনো পাতাও পতিত হয় না যা সম্পর্কে তিনি অবগত নন। যমীনের গহীন অন্ধকারে এমন কোনো শস্যদানা নেই এবং এমন কোনো শুকনো ও ভেষজ নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। [৭১] আল্লাহ তা'আলা আরো স্পষ্ট করে বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনিই মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। আর কোনো আত্মা জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিক অবহিত। [৭২]

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৬৭] সূরা নামল আয়াত: ১৬৫

[৬৮] সূরা হুজরাত আয়াত: ১৮

[৬৯] সূরা হুদ আয়াত: ১২৩

[৭০] সূরা ইউনুস আয়াত: ২০

[৭১] সূরা আনআম আয়াত: ৫৯

[৭২] সূরা লুকমান আয়াত: ৩৪

উল্লেখিত আয়াতে কারীমাগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, অদৃশ্যের যাবতীয় খবরাখবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। আর এসব আয়াতের সমর্থনে অনেক হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। অদৃশ্যের জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, এ বিষয়ে কুরআন মাজীদের এতো আয়াত ও একাধিক সহীহ হাদীস থাকার পরও বেরেলভী সূফিরা সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আকিদা পোষণ করে থাকে।

তারা বলে;

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون، بل يرون ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من أول يوم إلى آخره.

নিশ্চয় পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু সঙ্ঘটিত হয়েছে এবং হবে এসব বিষয় সম্পর্কে নাবীগণ শুধু জানেনই-না বরং দেখেন এবং উপস্থিত থাকেন।[৭৩]

তাদের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, নাবী রাসূলগণ পৃথিবীর সূচনা থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা সঙ্ঘটিত হবে এসব কিছু সম্পর্কে জানেন, এমনকি প্রতিটি কাজ তারা দেখেন এবং কর্মস্থলে উপস্থিতও থাকেন (আস্তাগফিরুল্লাহ)

নাবীদের প্রতি এতো বড় মিথ্যা অপবাদ ও এতো বড় বেয়াদবি কোনো মুসলিম করতে পারে?!!!

কারণ পৃথিবীর মানুষজন পাপ কাজে নিয়োজিত থাকার সংখ্যা অনেক বেশি এবং পৃথিবীর ইতিহাসে পাপীদের রাজত্বকাল ছিলো অনেক বেশি। এর বিপরীতে সর্বযুগে সৎকর্মশীল বান্দাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম ও সৎ মানুষদের রাজত্বও ছিল অনেক কম। কাজেই পৃথিবীর ইতিহাসে পাপ ও পাপাচারীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল আছে এবং ভবিষ্যতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর রাজত্বকাল ব্যাতীত কিয়ামত পর্যন্ত পাপ ও পাপাচারীদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকবে।

তাহলে বেরেলভীদের কথার সারমর্ম দাড়ালো যে, দুনিয়ার সর্বযুগের মানুষদের যেনা-ব্যাভিচার, হত্যা-লুণ্ঠন, মুর্তি পূজা, মাজার পূজা, মদ-জুয়া সহ যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন, আছেন ও থাকবেন এমনকি এসব কিছুতে তারা উপস্থিত থাকেন ও দেখেন??? (নাউযুবিল্লাহ)। এ মর্মে নবী ﷺ সম্পর্কে বেরেলভীদের বক্তব্য হলো-

أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المخلوقات والموجودات وجميع أحوالهم تماما وكمالا من ماضيهم وحالهم ومستقبلهم ،ولا يخفى عليه خافية. كما انه يعلم خالقهم و بارئهم.

নিশ্চয় নাবী ﷺ সমস্ত মাখলুক ও অস্তিত্ব সম্পন্ন সকল বস্তু সম্পর্কে জানেন, এবং তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তার কাছে কেউ কোনো কিছু গোপন করতে পারে না, যেমন তাদের সৃষ্টা থেকে তারা কোনো কিছু গোপন করতে পারে না।[৭৪]

তাদের কেউ কেউ আরো আগ বাড়িয়ে বলে যে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أحوال قلوب الجمادات والحيوانات ألا يعلم أحوال قلوب عشاقه ومحبيه" ((مواعظ نعيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع قدمه على حيوان لعلم الحاضر والغائب، فالوليُّ الذي يضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده كيف.

নিশ্চয় নাবী ﷺ, যিনি সকল জীবধারী প্রাণী ও নির্জীব বস্তুর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তিনি তার আশেকদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে কেন জানবেন না? নিশ্চয় তিনি তার পা যদি কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর রাখতেন তাহলে উক্ত প্রাণী দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আর আল্লাহর ওলী, যার উপর নাবী ﷺ হাত রেখেছেন তিনি কিভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয়াদী সম্পর্কে আলেম বা জ্ঞানী হতে পারেন না।[৭৫]

প্রিয় পাঠকমণ্ডলী; তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নাবী ﷺ কোনো চতুষ্পদ প্রণীর শরীরে পা রাখলে সে প্রাণী যদি

[৭৩] *মাওয়ায়িযুল নাঈমীয়্যাহ-আহমাদ ইয়ার খান আল বেরেলভী-১৯২ পৃ:, মাউসুআতুল ফিরাকিল মুনতাসাবা- ৮ম খণ্ড ৩৯০ পৃ:*

[৭৪] *মাউসুআতুল ফিরাক-৮ম খণ্ড, ৩৯১ পৃ:, আল বেরেলভিয়্যাহ- ৮২ পৃ:*

[৭৫] *মাওয়ায়িযুল নাঈমীয়্যাহ -৩৬৪-৩৬৫পৃ:, আল বেরেলভিয়্যাহ-৮২ পৃ:*

অদৃশের খবরাখবর জানাতে বিজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে থাকে তাহলে বাইতুল মালের সকল উট, ও ঘোড়াসহ অন্যান্য সকল প্রাণী গায়েব জানত। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তার ব্যবহৃত গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ও উটনী, খেলাফাতের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিত। আর নাবী ﷺ-এর হাতের স্পর্শ পেলে কোনো মানুষ যদি গায়েব বা অদৃশ্যের খবর সম্পর্কে মহাজ্ঞানী হয়ে যায়, তাহলে তো মা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সহ রাসূল ﷺ-এর সকল স্ত্রী সন্তান ও নাতীদ্বয় অদৃশ্যের খবরাদী সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়ার কথা। অথচ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বনু মস্তাকের যুদ্ধে যাওয়ার আগে একটুও জানতে পারলেন না যে, সেখানে তার মিথ্যার অপবাদ আরোপ করা হবে।

অপবাদ আরোপিত হওয়ার পর, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর উপর আরোপিত অপবাদ ঘোচানোর জন্য নাবী ﷺ নিজেই আসমানী ওয়াহীর অপেক্ষায় ছিলেন। উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু লুলুর হাতে নিহত হলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান মুলযিমের হাতে নিহত হলেন, অথচ তারা কিছুই জানতেন না। নাবী ﷺ-এর আদরের নাতী হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু কারবালায় শাহাদাত বরণ করলেন; অথচ পূর্ব থেকে কিছুই জানতে পারলেন না। তারা কেউ কি নাবী ﷺ-এর হাতের ছোয়া পাননি? আমি খুব আশ্চর্য হই এবং আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে। ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে যারা এমন প্রলাপ লেখেন তারা কি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন?

বেরেলভী সূফিদের আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট বক্তব্যের আরো একটি হলো-

أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيوب الخمسة التي هي مخصوصة بذات الله تبارك وتعالى.

নিশ্চয় নাবী ﷺ এমন পাঁচটি অদৃশ্যের খবর জানেন যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তার সাথে সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত।[৭৬]

এখানে আল্লাহর তা'আলার সত্তার সাথে নির্দিষ্ট ৫টি বিষয় বলতে বুঝানো হয়েছে:

১. কিয়ামত সঙ্ঘটিত হওয়ার জ্ঞান: তা কখন হবে, কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়।

২. বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার জ্ঞান: তা কখন, কোথায়, কিভাবে ও কতটুকু হবে ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

[৭৬] *আল বেরেলভিয়্যাহ-৮২ পৃ:*

৩. নারী জারায়ুতে যা রয়েছে তার জ্ঞান: নারীর জরায়ুতে পুরুষের ঔরষ থেকে যা আগমন করেছে নেককার নাকি বদকার, সৌভাগ্যশীল নাকি হতভাগা ও তা জান্নাতী নাকি জাহান্নামী ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

৪. ভবিষ্যতের উপার্জন সংক্রান্ত জ্ঞান: ভবিষ্যতে সে কী উপার্জন করবে, সম্পদের প্রাচুর্য পাবে। কি পাবে না, হালাল নাকি হারাম উপার্জন করবে, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

৫. মানুষের মৃত্যুর জ্ঞান: কখন, কোথায়, কিভাবে মৃত্যুবরণ করবে। পানিতে ডুবে, নাকি আগুনে পুড়ে, সিজদাতে নত অবস্থায় নাকি বিছানায়, রুগ্ন অবস্থায় নাকি সুস্থ অবস্থায়, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। যা সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত রয়েছে।

এ পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান যা আল্লাহ তা'আলার জাত-সত্তার সাথে সুনির্ধারিত। এসব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ কাউকেই দেননি এবং কখনও দেবেন না।

অথচ জাহেল বেরেলভীরা এ পাঁচটি বিষয়ের কতৃত্ব নাবী ﷺ-কে দিয়ে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছেন যা স্পষ্টতই শিরক। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনি মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। কেউ জানে না কোন জায়গায় সে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।[৭৭]

নাবী ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণীতে অদৃশ্যের জ্ঞান: যাকে নিয়ে তাঁর পোড়া কপাল উম্মাতরা এতো বাড়াবাড়ি করে ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এতো অতিরঞ্জন করে যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলার সমপর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতেও কার্পণ্য করে না। সেই নাবী মুহাম্মাদ ﷺ নিজের ব্যাপারে কী বক্তব্য পেশ করেছেন তা কিছুটা হলেও জেনে নেওয়া যাক।

[৭৭] *সূরা লুকমান আয়াত: ৩৪*
এছাড়াও সূরা রা'দ আয়াত: ৮৯, সূরা ত্বহা আয়াত: ১৫, সূরা আরাফ আয়াত: ১৮৭, সূরা আহযাব আয়াত: ৬৩, সূরা আনআম আয়াত: ২, সূরা যুখরুফ আয়াত: ৮৫ ও সূরা আনআম আয়াত: ৫৯ নং সহ আরো অনেক আয়াতে এ বিষয়গুলোর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরাঈল', যাতে নাবী ﷺ ও জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নাবী ﷺকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নাবী ﷺ বললেন:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ " ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}

এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক অবগত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলছি: এ দাসী তাঁর প্রভুকে প্রসব করবে। উটের নগণ্য রাখালেরা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। (অদৃশ্যের) পাঁচটি বিষয় যেগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর নাবী ﷺ কুরআন মাজীদের এ আয়াত। "কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকটে" সূরা লুকমান আয়াত: ৩৪ শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।[৭৮]

অর্থাৎ, প্রশ্নকারী যেমন কিয়ামতের কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত নয় ঠিক তেমনই আমিও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয় তথা কিয়ামত কখন-কিভাবে হবে এ সম্পর্কে অবগত নই।

এর অর্থ দাঁড়ায় যে, জিবরাঈল কিয়ামত কখন হবে এ বিষয়টা আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। সুবহানাল্লাহ!

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন:

مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ .

গায়েবের চাবি পাঁচটি যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

(১) জরায়ুতে কী লুকানো আছে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (২) আগামীকাল কী ঘটবে তা শুধু আল্লাহ তা'আলা জানেন। (৩) কখন বৃষ্টিপাত হবে তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (৪) কে কখন কোথায় মৃত্যুবরণ করবে তাও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (৫) কিয়ামত কখন সঙ্ঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।[৭৯]

জাবির বিন আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ؟، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ.

আমি নাবী ﷺ-এর নিকট শুনেছি তিনি মৃত্যুবরণ করার একমাস পূর্বে বলেছিলেন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো কিয়ামত সম্পর্কে? অথচ তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটে রয়েছে।[৮০]

যেখানে নাবী ﷺ নিজেই বলেছেন যে, তিনি গায়েবের খবর জানেন না, সেখানে সমগ্র পৃথিবীবাসীও যদি তাঁর গায়েব জানার বিষয়টি দাবি করে তবুও তা অবান্তর, মিথ্যা ও ঈমান বিধ্বংসী শিরকি দাবি হবে।

নবী ﷺ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বলেছিলেন:

«وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ "

যে তোমাকে বলে যে, নাবী ﷺ গায়েব জানেন সে মিথ্যা বলে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।[৮১]

সুতরাং অদৃশ্যের খবরাখবরের বিষয়ে নাবী ﷺ-এর অবস্থা ও অবস্থান যখন এমন, তখন অন্য কারো গায়েব জানার দাবি করা আর তার মুসলমানিত্ব বাতিল হওয়ার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে আমার মনে হয় না। কেননা মুসলিম আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে কখনই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব অন্যকে দেয় না। আল্লাহর আবিষ্কার ও কর্তৃত্ব অন্যকে দিলে শত চেষ্টা করেও মুসলমানিত্ব টেকানো যাবে না। **(চলবে... ইনশা আল্লাহ)**

[৭৮] *সহীহ বুখারী আয়াত: ৫০*

[৭৯] *সহীহ বুখারী হা: ৭৩৭৯*

[৮০] *সহীহ মুসলিম হা: ২৫৩৮*

[৮১] *সহীহ বুখারী হা: ৭৩৮*

কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পুনর্গঠনে প্রফেসর এ. এইচ, এম শামসুর রহমান স্যার (রহি:)-এর অবদান ভোলার নয়

মো: আবুল খায়ের★

১৯৮৩ সালের এম. এ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী হিসাবে আমি দৌলতপুর, বি, এল কলেজে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই। কিন্তু সেশন জটের কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। কোথায় থেকে পরীক্ষা দিব সে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ইতোমধ্যে আমার গ্রামের এক বন্ধু ইলিয়াছ আলী মোল্লা আমাকে ভাইজান বলে ডাকে, বর্তমানে তিনি জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন। আমাকে বললো, ভাইজান আমার এক আত্মীয় আছে বি, এল কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একটি বিষয়ের প্রদর্শক নাম মো: ইয়াকুব আলী সাহেব। আত্মীয়কে বললে আপনার জন্য পরীক্ষার সময় থাকার একটা ব্যবস্থা হবে ইনশা আল্লাহ। যাই হোক কিছুটা হলেও কথাটি শুনে একটু আশ্বস্ত হলাম। একদিন সময় করে দু'জনই দৌলতপুরে যাই এবং জনাব ইয়াকুব আলী সাহেবের সাথে আলাপ করলাম। তিনি আমাদের কথা শুনে বললেন, আমাদের একটা প্রেস আছে ওখানে, আব্দুল গনি নামে একজন ম্যানেজার তার পরিবার নিয়ে থাকেন। বর্তমানে তিনি বাড়ীতে গেছেন, তুমি ঐখানে আপাতত থাকতে পার। যদি ম্যানেজার তার পরিবারকে নিয়ে না আসে তাহলে পরীক্ষা পর্যন্ত থাকতে পারবে। আর যদি পরিবার নিয়ে আসে তাহলে থাকা যাবে না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকতে লাগলাম। ২/৩ দিন পরে ম্যানেজার গনি সাহেব আসলেন পরিবার ছাড়া। আমি তখন ম্যানেজার গনি ভাইকে বললাম, ভাই আপনি যদি ভাবিকে না নিয়ে আসেন তাহলে আমি পরীক্ষা এখানে থেকে দিতে পারতাম। ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বললেন, যে পর্যন্ত আপনার পরীক্ষা চলে সে পর্যন্ত আপনি এখানে থাকেন, আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে আসব না। আমি তখন মানসিকভাবে একটু শান্তি পেলাম। ঐ সময় পাবলায় জনাব ইয়াকুব আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় একটা মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ মসজিদে যেতাম নামাজ পড়ার জন্য এবং যেদিন জুম'আহ উদ্বোধন হয় আব্দুল মান্নান নামে একজন ইমাম খুৎবা দিয়েছিলেন আর আমি আজান দিয়েছিলাম। ঐ সময় মসজিদটি গোলপাতার ছাউনি ছিল এবং ইটের সেলিংয়ের ওপর ঢালাই দিয়ে শুরু হয়েছিল। জানি না এখন মসজিদটি কী অবস্থায় আছে। এদিকে উক্ত প্রেসে ৫/৭ দিন থাকার পরে জানতে পারলাম প্রেসটির মালিক প্রফেসর এ, এইচ, এম শামসুর রহমান স্যার, ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষক। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য প্রায় মাসোর্দ্ধ থাকার পরও স্যারের সাথে আমার সাক্ষাত তো দূরের কথা, দেখাও হয়নি। পরীক্ষা শেষে বাড়ীতে আসার বেশ কয়েক বছর পর হঠাৎ করে একদিন আমার এক দাদা, সাবেক গণপরিষদ সদস্য মরহুম মমতাজ আহমদ সাহেব আমাকে বললেন: কলারোয়া সরকারী কলেজে খুলনা থেকে আহলে হাদীসের একজন প্রফেসর শামসুর রহমান সাহেব অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেছেন। আমি শুনেই পরের দিন বিকালে বাড়ী হতে কলারোয়া কলেজে আসলাম স্যারের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। স্যারের রুমে সালাম দিয়ে ঢুকেই দেখি স্যার একটা কাঠের চেয়ারে বসা। পাশেই গদির একটা বড় চেয়ার পড়ে আছে। স্যারকে আমি প্রথমেই বললাম, আমি বোখালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজের একজন শিক্ষক আপনার পিরামিত প্রেসে থেকেই এম, এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। স্যার শুনে খুবই খুশি হয়ে বললেন, তুমি আমার প্রেসে থেকে পরীক্ষা দিয়েছ? এরপর মাগরিব পর্যন্ত আলাপ আলোচনা চলল এবং আমার নিকট হতে এলাকা জমঈয়তের গণ্যমান্য মানুষের নাম ঠিকানা শুনতে লাগলেন। তারপর আ: আজিজ নামে ঐ কলেজের এক পিওন ছিল আহলে হাদীস। তার নিকট নাস্তা নিয়ে আসার জন্য কিছু টাকা দিলেন। নাস্তা খাওয়ার পরে স্যার আমাকে প্রতিদিন বিকালে আসতে বলে ২টি বই দিলেন এবং বললেন পড়া শেষ করে আসবে। বই ২টি (১) সত্য চির অম্লান (২) আপন গৃহে অপরিচিত। পড়া শেষ করেই স্যারের সাথে

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ কলারোয়া, সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ*

প্রায়ই দেখা করতে যেতাম ৭/৮ কি: দূর থেকে। আর মাঝে মাঝে দেখা হত স্যারের এক আত্মীয় মো: তৌফিকুর রহমানের সাথে। তিনি বর্তমানে মুরারী কটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন এবং বর্তমানে কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এবার শুরু করলেন স্যার কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের পুনর্গঠনের কাজ। ঐ সময় স্যারের সান্নিধ্যে ঐ কলেজের হিসাব রক্ষক আমার শ্রদ্ধেয় স্যার জনাব মো: রফিকুর রহমান সাহেবও থাকতে লাগলেন। ঠিক ঐ সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় ঢাকা যাত্রাবাড়ী মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার সুযোগ্য এবং স্বনামধন্য শিক্ষক কলারোয়ার গর্ব হাফেয ড. মো: রফিকুল ইসলাম মাদানী সাহেব মাঝে মাঝে কলারোয়া আসতেন এবং স্যারের সঙ্গে দেখাও করতেন। হঠাৎ করে স্যার একদিন বললেন আবুল খায়ের কলারোয়া এলাকার জমঈয়তের একটি যোগোপযোগী কমিটি গঠন করতে হবে এবং একটা বাইন্ডিং খাতা আমার কাছে দিয়ে বললেন, তুমি লেখ। সভাপতি হাফেজ ড. মো: রফিকুল ইসলাম মাদানী সাহেব, সেক্রেটারী আমার নিজের নাম মো: আবুল খায়ের, যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে মো: তৌফিকুর রহমান সাহেবের নাম। অন্যান্য পদে জনাব মো: রফিকুর রহমান স্যার, মো: মতিউর রহমান সাহেব, আ: আজিজ, মাস্টার আ: মজিদ সাহেব, এরূপ কিছু নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, অত্র কমিটির সভাপতি জনাব হাফেজ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী সাহেব যিনি তখন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় কমিটির মসজিদ ও মাদরাসাবিষয়ক সম্পাদক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। শুধুমাত্র স্যারের প্রস্তাব এবং কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসকে পুনর্গঠনের জন্য তিনি আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি উপদেষ্টা হিসাবেও দায়িত্বে আছেন। এ সম্পর্কে যেটি সত্য সেটি ও বলা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি ওই যে স্যারের প্রস্তাব অনুযায়ী কলারোয়া এলাকা জমঈয়তকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিলেন। অদ্যবিধি শুধু কলারোয়া এলাকা নয়, সমগ্র সাতক্ষীরা জেলার উন্নয়নেও তাঁর ভূমিকা ঈর্ষণীয়। তিনি কলারোয়াসহ সমগ্র সাতক্ষীরা এবং যশোর প্রায় ৪০টিরও বেশি নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং পনর্নির্মাণ করে এলাকার মানুষের অন্তরে স্থান জুড়ে আছেন। তাছাড়া জমঈয়তের কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে পানির কল স্থাপন, অজুখানা নির্মাণ, ইফতার মাহফিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ, ইফতারসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনিই সক্রিয়ভাবে করেই যাচ্ছেন।

এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জমঈয়তমুখী করার লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের কার্যক্রম পরিচালনায় এক সময়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে পরিচিত হয়ে যায়। ঝাউডাংগায় একটি "ঝাউডাংগা সালাফিয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেটি তাঁর একটি বিস্ময় কর অবদান। বর্তমান মাদ্রাসাটি তিনি এবং তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র ঢাকা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য শিক্ষক জনাব মো: আব্দুর রউফ মাদানী সাহেবের পরিচালনায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে আমি নিজে কলেজের নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকায় তাছড়ি কলারোয়া উপজেলা, কলেজ শিক্ষার সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করার কারণে আমি জনাব তৌফিকুর রহমান সাহেবকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব দিয়ে নিজে জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করি-শুধুমাত্র জমঈয়তের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে। বর্তমানে সভাপতি হিসাবে আছেন কাকডাংগা সিনিয়র মাদ্রাসার অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: মফিজ উদ্দীন সাহেব আমি সহসভাপতি এবং জনাব তৌফিকুর রহমান অদ্যবধী সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে আমি মনে করি কলারোয়া এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যক্রমকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ সফলতার মূল নায়ক ছিলেন মরহুম প্রফেসর এ, এইচ এম শামসুর রহমান স্যার। তিনি একজন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশা-পাশি জমঈয়তের কার্যক্রমকে কিভাবে বেগবান করা যায়, কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় এ চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকতেন। স্যারের নির্দেশে প্রায়ই আমরা মিটিং করতাম স্থান ছিল কলেজের শিক্ষক

মিলনায়তন কক্ষ। মিটিং এ উপস্থিত সকলের নাস্তার টাকা স্যার নিজের পকেট থেকে দিতেন। আমার লেখা রেজুলেশন স্যারকে পড়িয়ে শুনাতে হত। তিনি প্রতি জুম্মায় এক একটি মসজিদে খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেতেন এবং সেখানে একটি করে কমিটি গঠন করতেন। এ প্রসঙ্গে স্যারের একটি ঘটনা না লিখে পারছি না। আমার গ্রামের মসজিদে যে দিন যাওয়ার প্রোগ্রাম হলো সেদিন সকালে আমি কলারোয়ায় আসলাম সাইকেলে, স্যারের যাওয়ার বাহন হেলিক্যাপটার, শুনে মনে হবে সে কি? হেলিক্যাপটার হলো সাইকেলের পিছনে ক্যরিয়ারে একটু কাপড় জড়ানো সাইকেলকেই সেই সময় হেলিক্যাপটর বলা হত। যাই হোক বর্ষাকাল ঐ দিন প্রচুর বৃষ্টিও হল। মসজিদে যেতে হলে কাদার ভিতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। স্যারকে বললাম স্যার যেতে পারবেন? চিকন পথ দুই পাশে পানি ভর্তি ধানের জমি। স্যার আমার পিঠে হাত রেখে কাদার ভিতর দিয়ে পার হলেন। স্যারের আগমনের সংবাদ পেয়ে মসজিদ লোকে ভর্তি। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহেব আসবেন এবং খুৎবা দিবেন। স্যার খুৎবা দিলেন এবং জনাব মমতাজ আহম্মাদ সাহেকে উপদেষ্টা, আমার চাচা ক্বারী আ: হামিদ সাহেবকে সভাপতি আর আমাকে সেক্রেটারী করে একটি কমিটি গঠন করলেন। এহেন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অল্প দিনের মধ্যে স্যার এলাকার সকল জমঈয়ত প্রেমিক মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। স্যার অগণিত বই লিখে জমঈয়তের খেদমত করে গেছেন।

তাছাড়া স্যারের জীবনে জমঈয়তের জন্য একটি যুগান্তকারী অবদান খুলনার 'মাহাদ আস সালাফী' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা। যেটি এখন সমগ্র বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। স্যারের মৃত্যুতে আমি মনে করি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস একজন দক্ষ এবং যোগ্য সংগঠককে হারালো। আর মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত হারালো একজন ক্ষুরধার কলম সৈনিককে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নির্লোভ, স্বচ্ছ একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দো'আ করি, স্যারকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।❑❑

ঈদে মিলাদুন্নাবীর বাস্তবতা ও কুরআন-সুন্নাহ'র ফায়সালা

(২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে)

জেনে রাখুন মানুষ পুণ্যের কাজ করতে গিয়ে যদি পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, হিদায়াতে চলতে গিয়ে যদি গুমরাহ হয়ে যায় এবং জান্নাতী হতে চেয়ে যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, তাহলে বিষয়টির গুরুত্ব কতবড় একটু চিন্তা করুন! মানুষ আজ যাকজমক ও চাকচিক্যের পাগল, তাই তার সামনে কোন কাজ চমকপ্রদ করে তুলে ধরলে সে মনে করে এটাই ঠিক, বস্তুত তা নয় বরং ইহা এক শয়তানী কৌশল, মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের প্রতিজ্ঞা হলো-আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ﴾

"সে বলে হে রব যে অপরাধের কারণে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আমি অবশ্যই আদম সন্তানের জন্য পৃথিবীতে সেটাকে চাকচিক্য করে তুলব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট বা গুমরাহ করে ফেলব।"[৮২] অতএব আল্লাহভীরু মুসলিমের কাছে আর অস্পষ্ট থাকতে পারেনা যে, প্রচলিত তথা কথিত ঈদে মিলাদুন্নাবী বা নাবী জন্ম দিবসের উৎসব চাই ১২ই রবিউল আওয়ালে হোক বা অন্য কোন দিনে হোক ইহা ইসলামের কোন ইবাদাত নয়, কারণ তা কুরআন হাদীস বহির্ভূত এক তামাসা। যা রাসূল ﷺ বা কোন সাহাবী তাবেয়ী এমনকি প্রসিদ্ধ ইমামগণও করেননি এবং কোন সম্মতিও দেননি, বরং এ জাতীয় নব উদ্ভাবিত কর্মকান্ড হতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন- ফলে তা বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত ভ্রান্ত বিদআত। অতএব একজন মুসলিমের নিকট নাবী ﷺ-এর জন্ম উৎসবের স্বপক্ষে প্রমাণের অসারতা ও সংশয় নিরসনের পর কুরআন ও সহীহ হাদীসের ফায়সালা অনুযায়ী ঐসব ভ্রান্ত ও গুমরাহী বিদআত হতে বিরত থাকা অপরিহার্য এবং মানুষকে তাহতে বিরত রাখার দাওয়াত প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নাবী ﷺ-এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে জান্নাতী হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণহীন নব উদ্ভাবিত বিদআত হতে বিরত থাকার মাধ্যমে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন আমীন! সুম্মা আমীন !!

[৮২] *সূরা আল হিজর আয়াত: ৩৯*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

অনুকরণীয় আদর্শ; মানুষ মুহাম্মদ ﷺ

মো. আবদুল হাই ❄

(পূর্বে প্রকাশের পর থেকে ২য় পর্ব)

শিশুর প্রাথমিক পাঠ : আজকাল অধিকাংশ বাবা মায়ের ধারণা, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের বিকল্প নেই। অথচ, মায়ের কাছেই যে শিশুর প্রাথমিক পাঠ এটা এখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আমরা এমনও দেখেছি যে, **'প্লে'** শ্রেণির বাচ্চার জন্য গৃহশিক্ষক রেখেছেন তথাকথিত সচেতন বাবা-মায়েরা। অথচ, অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, বাবা-মা বিশেষ করে মায়ের তত্ত্বাবধানে পাঠরত বাচ্চারা অধিক সৃজনশীল, মনোযোগী, অধ্যবসায়ী হয়ে থাকে। কারণ, এমন মা শুধু শিশুর পড়াশুনাতেই নযরদারি করেন না, বরং তার পাশাপাশি অন্যান্য দিকেও খেয়াল রাখেন।

তাই শিশুর প্রাথমিক পাঠটা হতে হবে বাড়িতেই এবং অবশ্যই তা নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে শুরু। এটাই ধর্মের অনুসৃত পাঠ। এজন্য শিশুকে খেলার ছলে ছোট ছোট দুআ, সূরা, আদব-কায়দা প্রাথমিক সবক দিতে হবে। তবে তা শিশুকে বিরক্ত করে নয়। শিশুর আনন্দময় মুহূর্তে, কোলে নিয়ে খেলতে খেলতে, ঘুমানোর সময়। অনেক সচেতন অভিভাবককে শেয়ার করতে শুনেছি যে, সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রী, সন্তান নিয়ে কুরআনের সবক, ছোট খাটো মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করেন। এসবের পাশাপাশি ইসলামি নাশিদ, শিশুতোষ ছড়া, আরবী, ইংরেজি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাষার শব্দ ভান্ডার ইত্যাদির পাঠ। এছাড়াও মার্জিত আচরণ, নম্র স্বভাব, সুন্দর করে কথা বলা- এগুলোও শিখবে আপনাকে দেখে। তাই এর যেগুলো আমাদের মধ্যে আছে সেগুলোর চর্চা বাড়িয়ে দিন। আর যারা এগুলো সম্পর্কে সচেতন নই, তারা চেষ্টা করতে থাকি সফলতার জন্য।

রাসূল ﷺ-এর প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়েছিল আরবের উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে। উপরে সুবিশাল আকাশ, আর নিচে খোলা প্রান্তর। আর দায়িত্বশীল অভিভাবকদের পাশাপাশি মহান স্রষ্টা বিশেষ কৌশলে শিক্ষা দিয়েছেন বৈচিত্র্যময় জগতের নির্ভুল, নিপুণ জ্ঞান। যার নির্ভুলতা, অপূর্ব বিশ্লেষণ কিয়ামত পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত। আর আমাদের জন্য এখনতো বহুমুখী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত। যেমন, স্কুল, ডে কেয়ার, কর্মমুখী মহিলাদের বাচ্চার জন্য চাইল্ড কেয়ার, বিভিন্ন ধরনের রিডিং ক্লাব, নিকটতম আত্মীয়স্বজন অথবা শিশুদের জন্য ফিটনেস সেন্টারগুলো। তবে এসবের মধ্যেও সবার আগে খেয়াল করতে হবে শিশুর নিরাপত্তা।

মৃত্যু যেখানে বাস্তবতা : মৃত্যু! এক কঠিন বাস্তবতা। জগতে যার প্রাণ আছে, মৃত্যু তার জন্য এক নির্মম সত্য। তাই, একে নিশ্চিত জেনেই গ্রহণ করতে হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মৃত্যুও একজন মানুষের জীবনে ব্যতিক্রমী প্রভাব ফেলে। যেমন, খুব আদর- যত্নে মানুষ, শুধুমাত্র মা'ই সম্বল, মা ঘেঁষা সন্তান, উপার্জনক্ষম মা, পরিবারে প্রভাবশালী মা ইত্যাদি। এমন মায়েদের সন্তানদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। কেননা, শিশুমন খুবই অনুভূতিপ্রবণ। এসব শিশুর জন্য মায়ের ভালোবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর মায়ের অনুপস্থিতি শিশুমনে প্রভাব ফেলতে খুবই বিরূপ।

ফিরে আসি শিশু মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনে। তিনি জন্মের পর মাত্র কয়েকদিন মায়ের স্পর্শ পেয়েছেন। এরপরেই চলে যান দাঈ মা হালিমার কাছে। গুণবতী হালিমা তাকে আপন সন্তানের চেয়ে কোন অংশেই কম আদর করেননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিই করেছেন। কারণও ছিলো কিছু। তাকে ﷺ নিয়ে ফিরে যাবার সময় থেকেই তিনি (হালিমা) তার চারপাশে অভূতপূর্ব কিছু ঘটনা অবলোকন করেন। মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে বরকতের অপূর্ব কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। এ ধারা অব্যাহত থাকে তার পারিবারিক আবহে। পুরনো সব চিত্রপট নতুন রূপে ধরা পড়ে তার কাছে। হাড় জিরজিরে বকরি- ভেড়াগুলো স্বাস্থ্যবতী হতে শুরু করে। চারণ

❄ *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও নির্বাহী পরিচালক শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)*

ভূমিগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। ছোট্ট শিশু মুহাম্মদ ﷺ যেখানে মেষ চরাতেন সেখানে মাথার ওপর মেঘের ছায়া থাকতো। এছাড়াও পরিবারের প্রতিটি জায়গায় অব্যাহত বরকত দৃশ্যমান হয়।

মুহাম্মদ ﷺ নিজেও কিছু আশ্চর্য ঘটনার কারণ হন। যেমন, তিনি যখন হালিমার দুধ পান করতেন, তখন শুধুমাত্র একটি স্তন থেকেই পান করতেন। চেষ্টা করেও তাকে অন্য স্তনটি থেকে পান করানো সম্ভব হয়নি। কেননা, তিনি সেটা রেখে দিতেন দুধভাই আব্দুল্লাহর জন্য। এছাড়া তিনি ক্ষুধার জন্য কখনো কাঁদেননি। কিন্তু লজ্জাস্থান হতে কাপড় সরে যাওয়ার উপক্রম হলে অস্থির হতেন এবং কাঁদতে থাকতেন। এসব ঘটনা ইতিবাচক বিষয় ছিলো। মূলত এই ঘটনাগুলোই তার প্রতি অন্যদের ভালোবাসাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি যে একজন অসাধারণ শিশু এটা বিভিন্ন সময়ে নানান জনের মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়।

এক কথায় হালিমার বাড়িতে তার আদর যত্নের কোন ঘাটতি ছিলো না। যা আসলে প্রতিটি শিশুরই প্রাপ্য।

এরপর দু'বছর পর মক্কায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসলে এই চিত্রের স্ফূরণ ঘটে। নিজের মায়ের কাছে দীর্ঘদিন পর ফিরে আসা। চাঁদের মতো উজ্জ্বল মুখ। মা তাই সবটুকু ভালোবাসা যেন উজাড় করে দেন সন্তানের জন্য। স্বামীহারা আমিনার তখন একমাত্র সম্বলই ছিল শিশু মুহাম্মদ ﷺ। কিন্তু যখন তার বয়স মাত্র ছয় তখনই তিনি মা হারা হয়ে যান। এমন বয়সে কষ্টটা তাই বাড়ারই কথা।

ছোট্ট শিশু মুহাম্মদ ﷺ কি তা বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি তো সাধারণ কোন বাচ্চা ছিলেন না। সেক্ষেত্রে তার জন্য এটি অবশ্যই আরো বেশি কষ্টকর ছিল বৈকি।

মায়ের পর : একটা শিশুর জন্য পৃথিবীতে মা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মা'র পরশই সন্তানের জন্য সুস্থভাবে বাঁচার প্রধান পাথেয়। কিন্তু সব শিশুর ভাগ্যে তেমনটি জোটে না। শিশু মুহাম্মদ ﷺ এর ভাগ্যেও মায়ের বিচিত্র আদর ও ভালোবাসা খুব বেশিদিন টেকেনি। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। আর মোটে মাত্র ৪ বছর মায়ের আদর পান। যা কোনভাবেই একটি শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তার অবস্থানটিতো কিছুটা ব্যতিক্রমই ছিলো বটে। কারণ, এটি ছিলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হয়তো গোটা বিশ্বের সব ইয়াতিমের জন্য তাকে সেভাবেই প্রস্তুত করে তুলছিলেন যাতে করে তিনি তাদের দুঃখ-কষ্ট সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। সেজন্যই বোধকরি মায়ের শোক তাকে খুব একটা ভাবিয়ে তোলেনি সেভাবে। কেননা, দাদা আবদুল মুত্তালিব ছোট্ট নাতির দেখাশুনার পুরো দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। যার প্রভাব রাসূলের ﷺ মাঝেও পড়েছিল। বিশেষ করে সামাজিক বলয় ও নেতৃত্বের বিষয়টি। কেননা, আবদুল মুত্তালিব ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এজন্য তার বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। আশাকরি, পাঠকদের কাছে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

◈ **আবদুল মুত্তালিব :** ছোট বেলায় বাবা হাশেম মারা যাওয়ার কারণে মায়ের কাছেই মানুষ। জন্মের সময় মাথার চুল সাদা ছিলো বলে তার নাম রাখা হয়, **'শায়বা'**। তিনি তার কওমের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান। একাধারে দানশীল, হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তিনি পান। দুটি বিশেষ ঘটনার কারণে তিনি মর্যাদায় অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যান। (এক) যমযম কুপ খনন, যার একক কর্তৃত্ব ছিল শুধু তার। (দুই) হস্তিযুদ্ধের ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততা। তার মধ্যে নেতৃত্বের অপূর্ব সব গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তার কাছেই প্রতিপালিত মুহাম্মদ ﷺ। সেজন্য তিনিও হয়েছিলেন বিচিত্রসব গুণাবলীর সমাবেশে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ঠিক যেন দাদা আব্দুল মুত্তালিবের প্রতিচ্ছবি।

◈**নেপথ্যে আছেন দাদিমা :** এটি কিছুটা আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের আলোচনায়, লেখনীতে, স্তুতিতে নারীরা বরাবরই কিছুটা উপেক্ষিত। কিন্তু একটি শিশুর প্রথম শিক্ষা, আদর ভালোবাসার বেশির ভাগই যে নারী তথা মা, বোন, দাদী-নানীর কাছ থেকেই তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। রাসূলের জীবনীতেও এ বৈষম্য আমরা রেখেছি। আমরা ক'জনই বা রাসূলের ﷺ দাদী-নানীর নাম স্মরণ রেখেছি বা জানি। অজ্ঞাতসারেই হোক বা অবহেলায়, রাসূলের পরিবারের মেয়েদের কথা আমরা কমই উল্লেখ করেছি। সত্যি কিন্তু! হিসাবে হয়তো তা ৫ শতাংশও হবে না। কিন্তু এটি সত্য যে, তার শৈশবে মায়ের অভাবে দাদার মতোই দাদীর অবস্থানও ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্তত, আমাদের বাস্তবতা তো তাই বলে।

হ্যা! সত্যিই তাই। রাসূল ﷺ এরও একজন দাদী ছিলেন। মায়ের অভাবে যিনি তাকে আগলে রেখেছিলেন পরম যত্নে। কেননা, একজন শিশুর এমন কিছু মৌলিক চাহিদা আছে যা কেবল একজন নারীই পূরণ করতে পারে। ছোট্ট শিশুর গোসল করানো, চুল আঁচড়ানো, খাওয়ানো, রাতে গল্প শোনানো, ঘুমানো এগুলো পুরুষ সদস্যরা নিয়মিত করে না নিশ্চয়ই। যদিও আপনার কাছে কাজগুলো খুব সাধারণ মনে হচ্ছে, কিন্তু ছয় বছরের একজন বালকের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বয়সের কোন বাচ্চাই একা একা এগুলো পূরণ করতে সক্ষম নন। মুহাম্মদ ﷺ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর বিশেষ কেউই না থাকায় সেটি যে তার দাদী-ফুফুই পূরণ করেছেন, এটি বলাই বাহুল্য। রাসূল ﷺ এর দাদীর নাম **'ফাতিমা আমর'**। আর তার মেয়েরও নাম ফাতিমা। কি অদ্ভুত মিল, তাই না!

আপনার জন্য : এখন প্রশ্ন আপনার কাছে। আপনার সন্তানের জন্য আপনি কতটুকু সময় দেন। নাকি ব্যস্ততায় কাটে আপনার সময়? সাথে আপনার স্ত্রীরও। বাড়িতে থাকে আপনার সন্তান অন্য কারো কাছে, নতুবা গৃহ-পরিচারিকার কাছে। সেটি কতটুকু সঙ্গত বলে আপনি মনে করেন? অথচ পরিসংখ্যন বলছে, সন্তান বিপথে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সন্তানের জন্য বাবা মার সময় না দেয়া।

আমাদের সমাজ বাস্তবতায় এমন কিছু চিত্র দেখি যা খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে কর্মজীবি বাবা-মার বিপথে যাবার হার অনেক বেশি। আর ছোট্ট শিশুর ওপর গৃহপরিচারিকার নির্মমতার অনেক দৃশ্যই আজ স্যোসাল মিডিয়ায় দেখি প্রতিনিয়ত। তাই আসুন একটু ভাবি!

◈ **যতটুকু সম্ভব সন্তানকে সময় দিন।** তাদের মতামতগুলো শেয়ার করুন। তাদের যৌক্তিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করার চেষ্টা করুন। নিয়মিত তাদের খোঁজখবর রাখুন। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলোর গুরুত্ব যাচাই করুন। অনেক সময় তাদের কাছ থেকেও পেতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ।

◈ **স্মরণ করুন!** বালক সুলাইমান ﷺ ও কিন্তু পিতার বিচারকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন। পিতা দাউদ ﷺ নিজেও সন্তানের রায়কে সঠিক বলে মেনে নিয়ে তাই চূড়ান্ত করেছিলেন। যে সন্তানের জন্য এতো কষ্ট করছেন, যার ভবিষ্যৎ নিয়ে এতো অস্থির, তার অনেক ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না। এই অজ্ঞতাটুকুর ফলাফল কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তার অসংখ্য উদাহরণ তো আপনার সামনেই ঘটছে। তাই সন্তানকে ভালোবাসুন। তার ভালো-মন্দের সাথেই থাকুন।

◈ **চাপিয়ে দিবেন না :** আপনার সন্তানের ওপর কিছু চাপিয়ে দিবেন না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। রাসূল ﷺ সামাজিক যেসব কাজ করেছেন, সেখানে চাচা আবু তালিবের পূর্ণ সমর্থন ছিল। (যেহেতু সে সময় তিনিই ছিলেন তার সরাসরি অভিভাবক)। আর শিশু মুহাম্মদ ﷺ চাচার পরিবারে বরকত হিসাবে বিবেচিত হতেন। তাকে ছাড়া আবু তালিব খাবার গ্রহণ করতেন না। তার যেকোনো কাজকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেন। আবু তালিব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করেও ভাতিজার কাজের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। **"গারে আবু তালিব"-এ** প্রায় ৩ বছর অবরুদ্ধ ছিলেন। এ কারণেই তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন কাফিররা তার সরাসরি কোন ক্ষতি করতে পারেননি।

◈ **তাই পরিশেষে বলতে চাই,** শিশুকে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে আপনার চেষ্টার পাশাপাশি নিয়মিত দুআ করতে থাকুন এভাবে,

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

"তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং সন্তানের পক্ষ থেকে তুমি তাদেরকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।[৮৩]

মহান আল্লাহ আমাদের সন্তানদের জন্য সৎ প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক। আমিন। **চলবে...**

[৮৩] *সূরা ফুরকান আয়াত:৭৪*

রবিউল আওয়াল মাস; জানা-অজানা তথ্য

আল-আমিন বিন আকমাল ★

ভূমিকা: প্রশংসা আদায় করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, লালন পালন করছেন, দয়া-মায়ার চাদরে আবৃত রেখেছেন, আমাদের পাপগুলোকে মানুষের আড়াল করে রেখেছেন, হাজারো অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া সত্বেও রিযিক দিয়ে যাচ্ছেন। দয়াময়-দয়ালু সেই মহান প্রতিপালকের শিখানো পদ্ধতিতে শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদু লিল্লাহ। শান্তি কামনা করছি মানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্ব মানবতার শান্তির সোপান, আমার আপনার ভালোবাসার প্রতিক মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুমীন হিসেবে রসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসার সম্পূর্ণ অংশই নিবেদিত। রাসূলকে যারা ভালোবাসতে পেরেছে তারা সকলেই রবিউল আউয়াল মাস সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে। সমাজে এখনো কিছু মুসলিম দাবিদার পাওয়া যাবে যারা মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতি আর সভ্যতাকেই মনে করে উন্নতর চূড়া। চলুন বিগত মাসের ন্যায় এ মাসেও আমরা জেনে আসি চান্দ্র বর্ষের ৩য় মাস রবিউল আউয়াল মাসের যতসব রহস্য ও গুরুত্বের কথা।

রবিউল আওয়াল অর্থ ও নামকরণ:

'রবি' শব্দের শাব্দিক অর্থ বসন্ত। আর এ রবিউল আওয়াল মাসেই শুরু বসন্তের ঋতু। এ জন্যই এ মাসের নামকরণ করা হয় রবিউল আওয়াল। আরো একটি মতামত পাওয়া যায়: রাসূল ﷺ-এর বংশীয় পঞ্চম পূর্ব পুরুষ কিলাব ইবনে মুর্‌রার যুগে (৪১২ খিষ্টাব্দ) তিনি এই মাসের নাম রাখেন রবিউল আওয়াল। জাহেলী যুগে এ মাসের নাম ছিল খাওয়্যান।[৮৪]

ধর্মপ্রিয় মুসলিমদের কাছে রবিউল আওয়াল:

জাহেলী যুগে আরবরা এ মাসকে ধোকার মাস বললেও মুসলিমদের কাছে এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মাসের ১২ তারিখে রাসূল ﷺ-এর জন্ম। এ ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও একই মাসের ১২ তারিখে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। এ মাসে ঘটে যাওয়া নানান ঐতিহাসিক ঘটনা বাড়িয়ে তুলেছে মাসটির মান-মর্যাদা। গৌরবান্বিত হয়েছে মুসলিম সমাজ।

স্মরণীয় পাতায় রবিউল আওয়াল:

নানান ঐতিহাসিক ঘটনা এ মাসের মান-মর্যাদা কিভাবে বাড়িয়ে তুলেছে চলুন জেনে আসি।

রবিউল আওয়াল মাসের স্মরণীয় কিছু ঘটনা।

*** রাসূল ﷺ এর জন্ম:** ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূল ﷺ-এর জন্মগ্রহণ করেন, তাই না..? নাহ! এটা বিশুদ্ধ না। আমিও জানতাম এ তথ্য। কিন্তু এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (হস্তী বাহিনীর বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদিকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজী পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল[৮৫]। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সুলায়মান মানসুরপুরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত এটিই।[৮৬]

*** রাসূল ﷺ-এর হিজরত:** রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হোন রবিউল আওয়াল মাসের ১ তারিখ বৃহস্পতিবার। মদীনায় পৌঁছেন ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে জুন মোতাবেক রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার।[৮৭]

*** উসমান বিন আফ্‌ফান রা:-এর বিবাহ:** ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ রবিউল

দায়িত্বশীল, সহীহ তা'লীমুল কুরআন ও হিফয বিভাগ, বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড।

[84] *wikli/شهور جاهلية وإسلامية*

[৮৫] *এপ্রিলের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার গোলমালের ফল।*

[৮৬] *রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৩৮-৩৯, আর-রাহীকুল মাখতুম: ৮১ পৃষ্ঠা।*

[87] *https://alimam.ws/ref/2177 (1-2)*
(محمد رسول الله (١/١٥٩)

আওয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিবাহ করেন। আর জুমাদিউল উখরাহ তে বাসর রাত সম্পাদিত হয়।[৮৮]

* **যি-আমরের যুদ্ধ:** যি-আমরের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় বানু আমরের নিকটবর্তী স্থানে। রাসূল ﷺ যখন বানি সা'লাবা গোত্রের নিকটে আসলেন তখন তিনি যুদ্ধের সংবাদ পেলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্রই উসমান বিন আফ্ফান রা: কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে রবিউল আওয়াল মাসের ১৮ তারিখ ৪৫০ জন সৈন্য নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ-এর খবর পেয়ে প্রতিপক্ষ বাহিনী পাহাড়ের চূড়ায় আত্মগোপন করে। আল্লাহর রাসূল ফিরে আসলেন। ১১ দিন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ কুচক্রি মহল থেকে কোন ষড়যন্ত্র বা কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এ যুদ্ধে দা'সূর বিন হারিস নামক এক কুচক্রি ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাথার পার্শে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাসূল ﷺ-কে ছায়াদানকারী গাছে ঝুলানো তার তরবারিটা কুচক্রি ব্যক্তি ছিনিয়ে নিয়ে রাসূল ﷺ-কে ঘুম থেকে জাগ্রত করিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ! আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে.? মুহাম্মদ ﷺ বললেন: আল্লাহ! কুচক্রি ব্যক্তির হাত কাঁপতে কাঁপতে তরবারিটা মাটিতে পড়ে গেল। রাসূল ﷺ তরবারিটা হাতে নিয়ে বললেন: এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? সে বলল: আমার কেউ নাই। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি কালিমা শাহাদাত পাঠ কর। সে কালিমা শাহাদাত **أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله** পাঠ করলো। সে তার জাতির কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার শুরু করলো[৮৯]।

* **বুওয়াতের যুদ্ধ:** ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক বলেন: বুওয়াতে রাসূল ﷺ কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান করার ইচ্ছা করলেন। ইবনে হিশাম বলেন: এসময় মদীনার দায়িত্ব দেন সাইব বিন উসমান বিন মাযউনকে। রাযওয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী বুওয়াতে গিয়ে রাসূল ﷺ পৌঁছলেন। এ যুদ্ধেও প্রতিপক্ষ বাহিনী পিছন ফিরে পালালো। রাসূল ﷺ মদীনায় ফিরে আসলেন। আর এবারে তিনি তাদের থেকে কোন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হননি। তাই তিনি রবিউস সানীর পুরো মাস ও জুমাদিউল আওয়াল মাসের কিছুটা সময় সেখানেই অতিবাহিত করলেন।[৯০]

* **রাসূল ﷺ এর মৃত্যু:** ৬৩২ খিষ্টাব্দের ৮ই জুন মোতাবেক ১২ই রবিউল আওয়াল ১১ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কিভাবে কাটাবেন এ রবিউল আওয়াল:

ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের সমাধান: এ বিষয়ে কথা বলার শুরুতে আপনার সামনে একটা হাদীসের একাংশ উপাস্থাপন করি:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

রাসূল ﷺ বলেন: সদা আমাকে সুন্নাত ও আমার সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে রাখবে। মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। আর সাবধান! অনেক নতুন নতুন বিদ'আত চালু হবে। জেনে রেখো সব বিদ'আতই ভ্রষ্টতা[৯১]।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর ৪৫০ বছর পরে ইরাকের শীয়া শাষক আবু সাঈদ কুকবুরী সর্বপ্রথম এই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করে[৯২]।

এ মীলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে সমাজে যত কিছুই হচ্ছে তার সবই এক উদ্ভ্রান্ত চিন্তা থেকে আগমন ও বিভ্রান্ত চিন্তার খোরাক হিসেবে পালিত।

সমাধান আপনার কাছে। কার অনুসরণ করছেন.....?

*এ মাসে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত না থাকলেও প্রতি মাসে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু কিছু আমল করতেন। আমলগুলো সফর মাসের ম্যাগাজিন থেকে দেখার অনুরোধ রইলো।

ইতি কথা:

হে আল্লাহ! আমরা তোমার ক্ষমার ভিখারী, আমরা তোমার দয়ার ভিখারী, তোমার দয়া ও মায়ার চাদরে আমাদের সদা আবৃত রেখো.! মৃত্যুমুখে শাহাদাত বাণী পাঠের তাওফিক দিও। আমীন।❑❑

---

[88] *(https://alimam.ws/ref/2177) (الحاوي الكبير الماوردي (١٤/٦١)*

[89] *https://alimam.ws/ref/2177#_ftn3 الحاوي الكبير (الماوردي (١٤/٦٢).*

[90] *(سيرة ابن هشام (١/٥٩٨). https://alimam.ws/ref/2177#_ftn8*

[৯১] *আবু দাউদ হা: ৪৬০৭*

[92] *https://bn.wikipedia.org/wiki/*

এক গৌরবময় অতীত থেকে বেদনাদায়ক বর্তমান; নেপথ্যে কারণ

মূল: জামিল আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মিশরী
ভাষান্তর : সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব ❁

প্রথম কিস্তি

পবিত্র নগরী মক্কায় ইসলামের প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকে মদীনায় একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ইসলাম বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। কুরাইশদের মূর্তিপূজা, আরব উপদ্বীপের ভেতর ও বাইরের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইসলাম এসব সমস্যা কাটিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার যুগে পূর্ব-পশ্চিমে ঠিকই ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও ইসলাম অসংখ্য অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সম্মুখীন হয়। আব্দুল্লাহ বিন সাবা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মুসলমানদের মাঝে বিরোধের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিরোধ এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, তরবারি কোষমুক্ত করতেও হয়েছিল। এরই জের ধরে উমাইয়া যুগেও বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে। অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিকট আকার ধারণ করে। আহলে কিতাব, পারসিক ও অগ্নিপূজকদের মধ্য হতে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মাঝে এবং প্রকৃত মুসলিমদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু মুসলিমদের ঈমানের সামনে তারা টিকতে পারেনি। তাদের সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। মুসলিমরা এত আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও ইসলাম তার নিজ গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানদের আকিদায় দুর্বলতা দেখা দেয়। তাদের নফসে বক্রতা ঢুকে যায়। এভাবেই তাদের মাঝে পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। এটা যেন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সেই বাণীর বাস্তবরূপ:

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[৯৩]

এক গৌরবময় অতীত থেকে বেদনাদায়ক বর্তমানে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বহিরাগত কারণের চেয়েও অভ্যন্তরীণ কারণগুলো বেশি প্রভাব ফেলেছিল। মুসলিম উম্মাহ যখন পরিপূর্ণভাবে ইসলামী অনুশাসনের আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল, তখন তার শাসন ইসলামী আইনকানুন অনুযায়ী হয়েছিল, সমাজ ইসলামী পদ্ধতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং উম্মতের আচার-আচরণগুলো ইসলামী শিক্ষা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু যখনই এ উম্মত ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকলো তখনই তাদের মাঝে দুর্বলতা ও বিরোধ দেখা দিল।

অভ্যন্তরীণ কারণ :

১. মুসলিমদের দলে-দলে বিভক্ত হওয়া : ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তি আজ সফল, তারা মুসলিমদের কাতারে চুপিচুপি অনুপ্রবেশ করে তাদের একতাকে বিদীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই খারেজী, শীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দল-উপদলের উৎপত্তি। তারা আজ অবধি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করে আসছে। এ লক্ষ্যে তারা মুসলমানদের বস্তুগত শক্তি, সামরিক সক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যকে নিজেদের মাঝে রক্তপাত ঘটানোর জন্য ব্যবহার করে আসছে।

২. দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় মগ্ন থাকা : আব্বাসী শাসনামলে (১৩২-২৩২ হিজরী) মুসলমানরা গ্রীক ও হিন্দস্থান-ভিত্তিক বিভিন্ন পুঁথি আরবী ভাষায় অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি একপর্যায়ে তারা ডিভাইন ফিলোসফি বা ঐশ্বরিক দর্শনের অনুবাদ শুরু করে। এভাবেই মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। মুসলিম জাতি এমন কিছু পার্শ্ব-বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা তাদের ইহকাল কিংবা পরকাল কোনো জায়গাতেই কাজে আসবে না। বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনুল মুকাফফা', হুনাইন বিন ইসহাক, সবিত বিন কুররাহ প্রমুখদের মতো যারা দর্শনের পতাকা ধারণ করেছিলেন, তাদের একটি মারাত্মক অভিপ্রায় ছিল; তারা নিজেদের

❁ উচ্চতর গবেষণা বিভাগ, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯৩] সূরা রাদ আয়াত: ১১

মতাদর্শ ও ধর্মকে ইসলামী ভাবধারায় প্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাদের উদ্ধৃত কথাবার্তার একটি বিরাট অংশ সুরিয়ানী থেকে আর কিছু অংশ ইহুদীদের থেকে প্রাপ্ত। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো এগুলো বর্ণনা করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের কোনো প্রবণতা দেখা যেত না। মানুষকে নিজেদের দলে ভেড়ানো, দ্বীনি মনমানসিকতাকে সুশোভিত করে তোলা এবং ইসলাম-বহির্ভূত বিষয় ইসলামে প্রবেশ করানোই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থে বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিয়ে আসতো। এভাবেই মানতেক বা তর্কশাস্ত্রের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইলমুল কালামের (যুক্তিবিদ্যা) আত্মপ্রকাশ ঘটে। (তাদের দৃষ্টিতে) এ ইলমুল কালাম হলো দার্শনিকের মানসিক ক্ষমতা বিকাশের একটি উপায়, যার সাহায্যে তিনি সক্রিয় মন বা সচল মস্তিষ্ক (Active Mind) অধিকার করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

কোনো কোনো ফকীহ কালামশাস্ত্র ও তা চর্চাকারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছাত্র ও সাথী, আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: যে কালামশাস্ত্রের মাধ্যমে দ্বীন অন্বেষণ করবে সে নাস্তিক হয়ে যাবে। যে রসায়নের মাধ্যমে ধনসম্পদ তালাশ করবে সে নিঃস্ব হয়ে যাবে, আর যে গরীব হাদীস খুঁজে বেড়াবে সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে।[৯৪]

ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আহলুল কালামের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হল- তাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরানো হবে এবং গাছের ডাল আর জুতা দিয়ে পেটানো হবে। যারা কিতাব-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে ইলমুল কালামের প্রতি মনোনিবেশ করবে, বলা হয়ে থাকে যে, এটাই তাদের যথাযোগ্য পাওনা! আর আমি আহলুল কালামের কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাদের কথায় আমার তাদেরকে মুসলমানই মনে হলো। কালামশাস্ত্র দ্বারা ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে শিরক ব্যতীত অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মাধ্যমে ফিতনায় পতিত হওয়া উত্তম।[৯৫]

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : বিষয়টা কি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের কাছে যদি একজন একটু বেশি বাকপটু লোক আসে, তাহলে কি আমরা তার যুক্তির কারণে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক আনীত বিধানাবলী ছেড়ে দেব?[৯৬]

ইবনুল হাসসার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: দ্বিতীয় শতকের পর খলীফা মামুনের শাসনামলে এ বিষয়ে প্রথম কথা বলা হয়।[৯৭]

চতুর্থ শতকে ইবনে সিনার (৩৭০-৪২৮ হিজরী) কল্যাণে দর্শন সরাসরি ইসলামী আকীদার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে থাকে। ইবনে সিনা সম্পর্কে আল্লামা হাফিয যাহবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি (ইবেন সিনা) হলেন মুসলিম দার্শনিকদের মাথা, যারা যুক্তির পেছনে ছোটে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে। [৯৮]

তিনি শেষ জীবনে তাওবাহ করেন। [৯৯]

তাহলে এ গ্রীক দর্শনশাস্ত্র অনুবাদ করে মুসলমানদের কী লাভ হল? তারা এমন একটি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো যা তাদের সময় ও বুদ্ধি উভয়টিকেই হত্যা করে ফেলেছিল।

অবস্থাদৃষ্টে তারা কুরআনকে গ্রীক মতাদর্শের সাথে মিলিয়ে ফেলেছিল। যেমনটি ইখওয়ানুস সফার বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই; তিনি বলেন:

'মূলত ইদ্রীস (আলাইহিস সালাম) হলেন হুরমুস, যিনি বহু হিকমতের বাহক ছিলেন। হুরমুস আত্মশুদ্ধি অর্জনের পর আসমানে আরোহণ করেন এবং আসমানের গ্রহ-নক্ষত্রকে সাথে নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে আসমান ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন আশ্চার্যজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। ইতঃপূর্বে যারা এভাবে আসমান প্রদক্ষিণ করেছিলেন শুধুমাত্র তারাই এ আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো দেখতে পেয়েছিলেন। স্বয়ং কুরআনে এর ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।[১০০]

---

[৯৪] *শারহুত ত্বহাবিয়্যাহ-পৃ:৭২*
[৯৫] *ঐ-পৃ: ২২৯*
[৯৬] *হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/৩২৪*
[৯৭] *আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী: ২/২১৩*
[৯৮] *সিয়ারু আলামীন নুবালা: ১৭/৫৩৫*
[৯৯] *ইবনু খালিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান: ২/১৬*

(তারা এখানে رَفَعْنَهُ দ্বারা 'আসমানে উঠিয়ে' উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, যা মোটেও সঠিক নয়)

কুরআনকে এভাবে বোঝা কোনোভাবেই জায়েয নেই। যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা সম্ভব নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

সালাফগণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এসকল আহলুল কালামদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। তাদের ঈমান-জিহাদ কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। কাফের ও বিদ'আতীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করাই তাদের কাজ।[১০১]

৩. মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে রাজনৈতিক বিভক্তি: পৃথিবীতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সফল! মানুষের মাঝে পারস্পরিক বিরোধিতা আরো বাড়িয়ে দিতে এবং স্বার্থ-দ্বন্দ্বকে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। যার ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝেও কোন্দলের সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। চতুর্থ শতকে এমন একটি সময় এসেছিল যখন মুসলিম বিশ্বে তিনজন খলীফা ছিলেন:

১. বাগদাদে আব্বাসী খলীফা, যিনি তৎকালীন শরয়ী খলীফা হিসেবে বিবেচিত হতেন।

২. মিসরে ফাতেমী খলীফা।

৩. আন্দালুসে উমাইয়া খলীফা।

স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম খলীফাদের এরকম পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বহিরাগত শত্রুদের লোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানদের শক্তি আস্তে আস্তে কমে আসছিল। এক পর্যায়ে ইসলামের সম্প্রসারণ স্থবির হয়ে পড়লো এবং পতনের সূত্রপাত ঘটতে লাগলো। অতঃপর উসমানী শাসনামলে নতুন উদ্যমে ইসলামী অগ্রযাত্রা সূচিত হয় ঠিকই, কিন্তু অতীতের দুর্বলতার বীজ তখনও বর্তমান ছিল।

৪. শু'উবী আন্দোলন : যারা আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাদেরকে শু'উবী বলা হয়। অর্থাৎ, যারা আরব জাতির বিরোধী পক্ষালম্বন করে। ইহুদী, নাসারা ও অগ্নিপূজারীদের মধ্য থেকে যারা ইসলামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো তারাই এ বিরোধের সূচনা করেছিল। অতঃপর, উল্লেখযোগ্য কিছু আরব গোষ্ঠী আরবের পক্ষালম্বন করে প্রতিবাদ শুরু করে। উভয় পক্ষই এক্ষেত্রে ইসলামের প্রাণশক্তিতে (দ্বীনি ঐক্য) সমস্যা সৃষ্টি করে। কেননা এ আন্দোলনের মূল ভাষ্য ছিল 'বিচ্ছিন্নতা'। এ আন্দোলন এমন এক মুহূর্তে ইসলামের মাঝে দুর্বলতা সৃষ্টি করলো যখন মুসলমানদের উপর বহিরাগত চ্যালেঞ্জ চেপে বসেছিল।

৫. বাতেনী সম্প্রদায় : ইসলামী বিশ্বের ভেতর থেকে যারা সবচেয়ে বড়ো আঘাত হেনেছিল বাতেনী সম্প্রদায়। জরাথুস্ট্রবাদ, মানি ধর্ম (Manichaeism), ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মধ্য থেকে যারা ইসলাম-বিদ্বেষী তাদের মূল মূল বিষয়গুলোর (বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড) সন্নিবেশ ঘটেছে এ বাতেনী বিশ্বাসে। তাদের ভাষ্যমতে: পুরো শরীয়ত জাহালত (অজ্ঞতা) দিয়ে কলুষিত। ভ্রষ্টতা মিশে আছে এর পরতে পরতে। একমাত্র দর্শনের সাহায্যেই তা ধুয়ে সাফ করা সম্ভব।[১০২] তাদের স্বীকৃতি মতে, বস্তুর খোসার ভেতর যেভাবে মজ্জা থাকে, কুরআন ও হাদীসেরও বাহ্যিক বিষয়াবলীর পাশাপাশি কিছু বাতেনী (অভ্যন্তরীণ) বিষয় রয়েছে।

৬. সূফীবাদ : দুটি বিপরীত ঝর্ণার সাক্ষাতের ফলাফল হল সূফীবাদ:

ক. কতিপয় ইবাদতগুজার মুসলিমকে দুনিয়াবিমুখিতা এবং বৈরাগী জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে; তিনি বলেন:

ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

সকল দলের কী হলো- যারা এমন এমন কথা বলে (কিন্তু আমি) রাত্রির (কিছু অংশে নামায পড়ি, আবার নিন্দ্রা যাই; রোযা রাখি আবার রোযা ভঙ্গ করি এবং স্ত্রী

[১০০] *সূরা মারইয়াম আয়াত: ৫৭, [রিসায়িল ইখওয়ানুস সফা: ১/১৩৮*
[১০১] *মুওয়াফাকাত সহীহিল মানকুল লি সরীহিল মা'কুল: ১/২৩৮*
[১০২] *ইখওয়ানুস স্বফা: ১/৬, দারুস স্বদির, বৈরুত*

গ্রহণ করি, যে আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।

রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর এদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারা দুনিয়ার নেয়ামতের প্রতি অতিমাত্রায় বিমুখতা প্রদর্শন করতে থাকে। এসব লোকদের মাঝেই সূফীবাদ জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়; কেননা এরকম চিন্তা-চেতনা সূফীবাদের জন্য যে এক উর্বর ভূমি!

২. মুসলিমদের মাঝে দুটি উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটেছিল:

ক. ইশরাকী দার্শনিকদের দর্শন বা Illuminationism: তারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সংস্কারের মাধ্যমেই আল্লাহর মারেফাত লাভ করা সম্ভব।

খ. মানবদেহে আল্লাহর অবতরণ (অবতারের প্রতি বিশ্বাস) : প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা যখন খ্রিস্টানদের সাথে মিশতে লাগলো তখন ইসলামের সাথে মিথ্যা সম্পর্কস্থাপনকারী কিছু দল-উপদলের মাঝে এ চিন্তাধারার প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর একে একে সাবাইয়্যাহ (আব্দুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী), কায়সানিয়্যাহ, কারামেতাহ এবং বাতেনীয়্যাহ সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মাঝে এ বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অতঃপর 'হুলুল'-এর বিশ্বাস তার সর্বশেষ রং ধারণ করে কিছু সূফীর মাঝে বিস্তার লাভ করে।

চতুর্থ ও ৫ম হিজরী শতকে সূফীবাদের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এর দূরত্ব আরো বাড়তেই থাকে। একপর্যায়ে যারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতো তাদেরকে তারা 'আহলুয যাহের' বলে ডাকতো। আর তারা নিজেদের নাম রেখেছিল 'আহলুল হাকীকত ও আহলুল বাতেন'।

হকপন্থী ইমাম ও আলেম সমাজ এসব দার্শনিক, বাতেনী ও সূফীদের অভিপ্রায় ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। হক্বের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহর সহায়তায় তাদের বিদ'আতী চিন্তাধারাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে তাদের (আলেমগণের) পরিশ্রম ছিল বর্ণনাতীত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম চতুষ্টয়। অতঃপর একনিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি); বিদ'আতীদের শির, কালামশাস্ত্রের বোদ্ধা, দর্শনের খুঁটি-সদৃশ বহু লোকের বিরুদ্ধে তাদের দাপুটে কার্যক্রম দেখার মতো।

আধুনিক সময়ে সূফীবাদের বিরোধিতায় উল্লেখযোগ্য কিছু মুখ হল- শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, শাইখ দেহলভী, শাইখ আবূ যুহরাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। *(চলবে, ইন্‌শা আল্লাহ)*

শিক্ষক আবশ্যক

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **"মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া"** যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন আরবী শিক্ষক ও একজন ক্বারী আবশ্যক।

আগ্রহী প্রার্থিকে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

অধ্যক্ষ
মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪
মোবাইল: ০১৭৭৮-১৬৪৭৭৩
০১৭২০-১১৩১৮০

সংশোধনী

গত ৪র্থ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পর্বের ১৫ নম্বর প্রশ্নটি ২ বার উল্লেখিত হয়। যা মূলত "তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত কখন শুরু ও কখন শেষ হয়? বেতর নামায এশার নামাযের সাথে পড়ে নিলে পরে তাহাজ্জুদ নামাযের সুযোগ থাকে কি না"-এ প্রশ্নের উত্তর ছিল।

অনাকাঙ্খিত এ ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

কবিতার সমাহার

মহা বাটপারী

আলাউদ্দীন বিন আলীমুদ্দীন★

বিচারক ঘুষ খেয়ে যদি
না করে হক্ব বিচার,
বেড়াতে যদি খায় ফসল
রক্ষা হবে কিসে আর?
রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলে
নেই কোনো রক্ষার উপায়,
তাইতো দেখছি অরক্ষিতের
সয়লাব চলছে বিশ্বময়।
মানুষ নামের পশুগুলোর
পশুত্বের কালো ছোবলে,
মানবতার সুন্দর সমাজ
অধঃপতনের অতলে।
হারাম-হালাল সব-ই খাচ্ছে
মানুষ নামের অজগর,
সব রকমের খাবার খেয়েও
ভরছে না তাদের উদর।
মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিয়ে
করছে বড় দাতাগিরি,
বিপরীতে জমিজমা সব
করে দিচ্ছে ছেলেদের রেজিস্ট্রি।
পিতা-মাতায় হত্যা করে
পাড়ি দিচ্ছে প্রেমসাগর,
অন্যায় আর অবিচার
করছে তারা জীবনভর।
আবর্জনা আর জাল-ভেজালে

★ *মাদ্‌রাসা দারুস সালাম আস-সালাফিয়্যাহ্ চারঘাট, রাজশাহী।*

الأبيات الشعرية

سماج گেছে আজ ভরি,
শাসক শাসিতের মিলন মিলে
সব খানে তাই বাটপারী।
প্রেমিকের হাত ধরে জননী
সন্তানকে দিচ্ছে বলি,
ন্যাক্কারজনক এ কাহিনী
কেমন করে যাই বলি।
বক্তাগণের বক্তৃতায়
জাল-ভেজালের নেই সীমা,
মুসলিম সমাজের জন্য ইহা
বড় ধরনের একজিমা।
গল্প কারের গল্প আজ
রঙ্গ রসে ভরা,
তাইতো তাদের গল্পে সমাজ
যাচ্ছে নাকো গড়া।
বহু রকমের বই লেখে আজ
সমাজের মাঝে দিচ্ছে ছাড়ি,
দলীলবিহীন মিথ্যা কথায়
মানুষ যাচ্ছে আমল করি।
অফিসগুলো গরম হচ্ছে
যেন সুদ-ঘুষের বড় মহাজন,
তাই ধোকায় পড়ে যাচ্ছে
দেশের যত জনগণ।
ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে
অবাধে চালায় গুলি,
এমনি করে অকালেই
কত জীবন যায় চলি।
বিশ্বজুড়ে সব সেক্টরে
চলছে শুধু বাটপারি,
মনের মাঝে ভাবনা জাগে
এই মুহূর্তে কী করি?

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) *জন্ম দিন পালনের বিধান কী?*

একরামুল হক,তিতাস, কুমিল্লা

উত্তর: কুরআন ও সহীহ হাদীসে যে বিষয় সম্পর্কে কোনরকম আলোচনা নেই তা ইসলামের নামে পালন করাই হলো বিদ'আত যা গ্রহণ ও পালন করা মুসলিম জাতির জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে।[১] এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

যে আমাদের দীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[২]

সুতরাং যে বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি, রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে-কেরামও করেননি, তা একজন মুসলিম ব্যক্তি কোনক্রমেই করতে পারে না। অতএব প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে জন্মদিন পালন করা থেকে বিরত থাকা একান্তই আবশ্যক।

প্রশ্ন (২) : *নবীর জন্মদিন বা মিলাদুন্নাবী পালন করা যাবে কি?*

রিফাত, বরকল, রাঙ্গামাটি

উত্তর: যারা নবীর জন্মদিন বা মিলাদুন্নাবী পালন করে থাকে, তারা দাবি করে থাকে যে, তারা আশেকে রাসূল বা রাসূল প্রেমিক, এ জন্য তারা এ দিবসটি পালন করে থাকে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে নবীকে ভালোবাসার একমাত্র দিক হলো তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাতের ওপরে আমলের মাধ্যমে পূর্ণ আনুগত্য করা। তিনি যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

তোমাদেরকে রাসূল যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[৩] এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সাহাবায়ে কিরাম, তদুপরি তারা কোন দিন নবীর জন্ম দিন বা মীলাদুন্নাবী নামে কোন আচার-অনুষ্ঠান করেননি বা ঐ দিনটি পালন করেননি। মূল কথা হলো, ১২ রবিউল আওয়াল যে রাসূলের জন্মদিন এ কথাও সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং এ বিষয়ে অনন্য সাধারণ সীরাত গ্রন্থ আর-রাহীকুল মাখতুম-এর লেখক আল্লামা সফিউর রহমান মুবারাকপুরী (রহমাহুল্লাহি), সাইয়েদ সোলাইমান নদভী, সালমান মনসুরপুরী এবং মুহাম্মদ পাশা ফালাকীর বরাতে বলেছেন: রাসূল ﷺ ৯ রবিউল আওয়াল মুতাবেক ২০ বা ২২ এপ্রিল সোমবার ৫৭১ ঈসায়ী সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ১২ রবিউল আওয়াল সহ অন্যান্য যে কোন দিনে বা তারিখে মীলাদুন্নাবির নামে কোন অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩) : *ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে ১২ রবিউল আওয়ালে অথবা রবিউল আওয়াল মাসে, যে কোন সময় বা দিনে সীরাতুন্নাবী নামে কোন আলোচনা সভা বা প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান করা যাবে কি?*

ফজলে রাব্বী, পেকুয়া, চট্টগ্রাম

উত্তর নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বকালের সর্ব সেরা নাবী ও রাসূল। তিনি বিশেষ কোন সময়, কাল বা সুনির্দিষ্ট মাসের জন্য নন। তাঁর সীরাত বা জীবনী নিয়ে যে কোন সময় আলোচনা হতে পারে। তাই যারা সারা বছরের অন্য কোন মাসে বা দিনে এমনটি অনুষ্ঠান করে না তাদের জন্য শুধুমাত্র ১২ রবিউল আওয়ালে বা রবিউল আওয়াল মাসে বিশেষভাবে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করা সমীচিন নয়। কারণ ১২ রবিউল আওয়ালে অথবা রবিউল আওয়াল মাসে সাহাবায়ে কেরাম এ ধরণের কোন অনুষ্ঠান করেননি। এ কথাটিও সকলেরই জানা যে, রাসূল ﷺ-এর

[১] *সূরা আল আহযাব আয়াত: ২১*

[২] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮*

[৩] *সূরা হাশর আয়াত: ৭*

পর তাঁর ব্যাপারে কোন কিছু করা এবং না করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। আর যারা শুধুমাত্র ১২ রবিউল আওয়ালে অথবা রবিউল আওয়াল মাসে এ অনুষ্ঠান করে থাকে, তারা মূলত শরীয়ত পরিপন্থী এবং কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আলোচনাই বেশী করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন।

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

অর্থ, আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত সমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবেনা, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।[৪]

আর যদি কেউ সঠিক আলোচনাও করতে চায়, তাও ১২ রবিউল আওয়ালে অথবা রবিউল আওয়াল মাসে না করে বছরের অন্য যে কোন সময় করা ভালো।

☞ প্রশ্ন (৪) : *ধর্মীয় কোন বিষয়ের উল্লেখপূর্বক মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠনো যাবে কী?*

সৌরভ হালদার, কালাই, জয়পুরহাট

উত্তর: ধর্মীয় বা ইসলামের কোন বিষয়ে অন্যদেরকে উৎসাহিত করার জন্য অথবা কোন বিষয়ে সতর্ক করার জন্য ম্যাসেজ পাঠানো যেতে পারে যেমন: সালাত, সিয়াম যথারীতি আদায়ের জন্য, যাকাত প্রদানের জন্য, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য হজ্জের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং পাপের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মাঝে মধ্যে ম্যাসেজ পাঠানো দাওয়াতী কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ মর্মে বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»

অর্থ: যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে সে ঐ ব্যক্তির সমান সওয়াব অর্জন করে যে তার অনুসরণ করে, এতে অনুসরণকারীদের সওয়াব সামান্য পরিমাণও কম করা হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে সে ঐ ব্যক্তির সমান গুনাহ বহন করে যে তার অনুসরণ করে, এতে তাদের গুনাহ থেকে কোন কমতি করা হবে না।[৫]

তবে, এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় দেখা যায় যে, ম্যাসেজে লেখা থাকে এ ম্যাসেজটি অন্যকে পাঠালে অমুক বিপদ থেকে মুক্তি বা অমুক জিনিস হাসিল হবে। এমন বিশ্বাস নিয়ে ম্যাসেজ আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। কেননা উপকার ও ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

☞ প্রশ্ন (৫) : *কুরআন তিলাওয়াত অথবা খতম করার পর মৃত ব্যক্তির জন্য বখশিয়ে দেয়া কি শরীয়ত সম্মত? ইবরাহীম খলিল, বটিয়াঘাটা, খুলনা*

উত্তর: আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকায় বা সমাজে কুরআন তিলাওয়াত বা খতমের পর দু'আর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য বখশিয়ে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। কারণ, এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীম এবং সহীহ হাদীস তো দূরের কথা কোন যঈফ বা জাল হাদীসেও এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং মৃত ব্যক্তির নামে কোন বাড়িতে বা কোন মসজিদ মাদরাসায় অথবা কবরের পার্শ্বে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত বা খতম করার পর বখশিয়ে দেয়ার বিষয়টি নব আবিষ্কৃত, তাই এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। শারঈ বিষয়ে কোন কিছু করার ব্যাপারে অবশ্যই শরীয়তের দলীল লাগবে। আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

তোমাদেরকে রাসূল যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[৬]

---

[৪] *সূরা নিসা আয়াত: ১৪০*

[৫] *সহীহ মুসলিম হা: ২৬৭৪*

[৬] *সূরা হাশর আয়াত: ৭*

এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে। কারণ প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত (দীনের ক্ষেত্রে) বস্তুই বিদ'আত আর সকল বিদ'আতই হলো ভ্রষ্টতা।[৭]

প্রশ্ন (৬) : কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা বা কুরআনের বিশেষ কোন সূরা অথবা কোন আয়াত পাঠ করা এবং যে কোন দুআ করা যাবে কি?

হাফিজুর রহমান, সদর, ময়মনসিংহ

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা।[৮]

নবী করীম ﷺ বলেছেন:

مَا بعث الله من نَبِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يدل أمته على خير مَا يُعلمهُ لَهُم وَيُنْذرهُمْ شَرّ مَا يُعلمهُ لَهُم.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যত নবী প্রেরণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব ছিল যে, যে বিষয়গুলোকে তারা কল্যাণকর হিসাবে জানতেন, সে সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা এবং যেসব বিষয়কে ক্ষতিকর হিসেবে জানতেন তা থেকে উম্মতকে সতর্ক করা।[৯]

এসব দলীল এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআনুল কারীমে যেসব আমলের বর্ণনা নেই, রাসূল ﷺও করেননি এবং তাঁর উম্মতের কাউকে করতেও বলেননি, তা পরবর্তীকালের মানুষের জন্য কোনক্রমেই সমীচীন নয়। সুতরাং কবর যিয়ারতের সুনির্দিষ্ট দু'আ বাদে অন্য কিছু পাঠ করা যেগুলো মৃত ব্যক্তির কোন কল্যাণে আসবে না, তা পাঠ করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির নিকট চাওয়া-পাওয়ার দুআ করলে তা হবে সম্পূর্ণ হারাম।। যে দু'আটি রাসূল ﷺ কবর যিয়ারতের সময় সাহাবীদেরকে পড়তে শিখিয়েছেন তা হলো:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ, কবরের অদিবাসী হে মুমিন-মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমরাও আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো ইন শা আল্লাহ। আমি আমাদের এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি।[১০]

প্রশ্ন (৭) : কবর যিয়ারতের নির্দিষ্ট কোন দিন বা সময় আছে কি এবং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরে সফর করার বিধান কি?

জসিম উদ্দিন, শ্রীপুর, মাগুরা

উত্তর কবর যিয়ারতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দিন বা সময় নেই যখন ইচ্ছা বা সময়-সুযোগ হয় তখনই কবর যিয়ারত করা যায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

فَزُورُوا القبور - فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ .

সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১]

বিশেষ কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য দূরে কোথাও সফর করা বৈধ নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন:

" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى "

[৭] *আবূ দাউদ হা: ৪৬০৭*
[৮] *সূরা আহযাব আয়াত: ৭*
[৯] *ফাতাওয়া মুহিম্মাহ লি উমুমিল উম্মাহ*
[১০] *সহীহ মুসলিম হা:৯৭৫*
[১১] *সহীহ মুসলিম*

তোমরা তিনটি মসজিদ বাদে অন্য কোথাও (বরকত লাভের উদ্দেশ্য) সফল করবে না। মসজিদগুলো হলো: মসজিদুল হারাম (মক্কায়), রাসূল ﷺ-এর মসজিদ (মদিনায়) ও মাসজিদুল আকসা (ফিলিস্তীনে)। সুতরাং এ হাদীসের আলোকে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা বৈধ নয়। যেমনটি আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশে হয়ে থাকে বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ওলী-আওলিয়ার কবর বা মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

☞ প্রশ্ন (৮) : *যে মসজিদে অথবা মসজিদের সামনে কবর আছে, সেই মসজিদে সলাত আদায়ের বিধান কী?*

নাইমুল হক, লাখাই, হবিগঞ্জ

উত্তর যে মসজিদে অথবা মসজিদের সামনে অর্থাৎ কিবলার দিকে কবর আছে তাতে সলাত আদায় করা বৈধ নয়। কারণ মসজিদ হলো সিজদা করার জন্য আর কবরে সিজদা করা হারাম। কাজেই মসজিদের ভিতরে অথবা সামনের দিকে কবর দেয়া বা রাখা যাবে না। যদি থাকে তাহলে সে মসজিদে সালাত জায়েয হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন :

«صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»

তোমরা ঘরের মধ্যে (নফল) সলাত আদায় করো, ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করো না। [১২]

হাদীসের ভাবঅর্থ হচ্ছে: কবরে যখন সলাত আদায় করা নিষেধ, তোমাদের ঘরকে অনুরূপ করো না, অর্থাৎ ঘরে (নফল) সলাত আদায় করবে পক্ষান্তরে যেখানে কবর আছে সেখানে সলাত আদায় করবে না।

সুতরাং কোন মসজিদে অথবা মসজিদের সামনে কেবলার দিকে কবর থাকলে সেই মসজিদে সলাত আদায় বৈধ হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।[১৩]

☞ প্রশ্ন (৯) : *জানাযার সলাতে সানা ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিধান কী?*

আব্দুল মুমিন, শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তর আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোক জানাযার প্রথম তাকবীরের শুরুতে শুধু সানা পড়ে থাকে, সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। আবার কিছু লোক সানা এবং সূরা ফাতিহা উভয়টি পাঠ করে থাকে। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলে যেভাবে পাওয়া যায় সেভাবেই আমাদের জন্য গ্রহণ এবং আমল করা উচিত। হাদীসে জানাযার সালাতে সানা পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয় এবং সাহাবীদের আমলেও পাওয়া যায় না। এ মর্মে এক সময়ের বিশ্বনন্দিত আলিম শাইখ উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটি (সানা পড়া) মুস্তাহাব নয়। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন যে, জানাযার সলাত যেহেতু সংক্ষেপে পড়ার নিয়ম তাই দু'আ ইস্তিফ্তাহ অর্থাৎ সলাত আরম্ভের দু'আ বা সানা জানাযার সলাতে নেই।[১৪] আর সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে পড়তে হবে বলে যেহেতু দলীল রয়েছে সেহেতু সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। এ ব্যাপারে আম বা সাধারণ দলীল, যা সকল সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা হলো: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না।[১৫]

এ ব্যাপারে খাস বা বিশেষ হাদীস যা তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন আউফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পেছনে জানাযার সলাত পড়লাম, তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং বললেন, লোকেরা যেন জানতে পারে যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। সহীহ বুখারী ।

অতএব, জানাযার সলাতে সানা পড়ার বিষয়টি যেহেতু হাদীসে নেই, তাই পড়ার দরকার নেই। পক্ষান্তরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত, তাই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। আল্লাহু আ'লাম।

---

[১২] *সহীহ মুসলিম হা: ৭৭৭*

[১৩] *সহীহ বুখারী হা: ৪৩৫*

[১৪] *মাজমু' ফাতাওয়া লি ইবনে উসাইমীন-১৭/১১৯*

[১৫] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*